জগৎশেঠের রত্নকুম্ভ

৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

প্রথম অধ্যায়
ঘটনারহস্য

দোতালার বৈঠকখানা। আসনে আসীন দুই বন্ধু—ভাব যাদের গলায় গলায়। জয়ন্ত ও মানিকের কথা বলছি। চলছিল আলোচনা। সরকারী পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগের বিখ্যাত কর্মচারী সুন্দরবাবু সম্প্রতি 'পেন্সন' নিয়েছেন, তাই নিয়েই আলোচনা।

মানিক মত প্রকাশ করলে, "জয়ন্ত, এইবার আমাদের গোয়েন্দাগিরির শখ বোধহয় সিকেয় উঠলো।"

জয়ন্ত বললে, 'কেন ?"

—"আমাদের বেশীর ভাগ মামলা আসত সুন্দরবাবুর মারফতেই। তিনি নিলেন অবকাশ, এখন আমাদের সে শখ কে মেটাবে ?"

—"মেটাবে আমাদের খ্যাতি। তুমি কি ভেবেছ এতদিন ধ'রে আমরা কি কেবল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ালুম ? মোটেই নয়, মোটেই নয়! শৌখিন হলেও দেশ আর দশের কাছে আমরা এখন অপরিচিত নই। পুলিসে সুন্দর-বাবু না থাকলেও আমাদের অলস হ'য়ে ব'সে থাকতে হবে ব'লে মনে করি না। ঐ

শোনো! সিঁড়িতে কোন বৃহৎ মূর্তির পদশব্দ! বোধহয় নাম করতেই সশরীরে সুন্দরবাবুর আবির্ভাব আসন্ন!"

ঠিক তাই! বিপুল ভুঁড়ির ভার নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ঘরে ঢুকেই সুন্দরবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা চেয়ারের উপর ধুপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন এবং এই অনুচিত অতিরিক্ত ভারের বিরুদ্ধে চেয়ারখানা সশব্দে প্রতিবাদ ক'রে উঠল!

মানিক সহাস্যে বললে, "ভো সুন্দরবাবু! আপনার নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি নিজে আবির্ভূত হ'য়ে ইংরেজী প্রবাদটার সত্যতা প্রমাণিত করলেন!"

মানিকের রসনাকে সুন্দরবাবু বরাবরই ভয় ক'রে আসছেন। সন্দিগ্ধস্বরে বললেন, "হুম্! কি প্রবাদ?"

"জানেন না? 'Talk of the devil and he will appear!' অর্থাৎ কিনা, দৈত্য-দানবের কথা তুললেই তার উদয় হয়!"

সুন্দরবাবু রেগে চোখ কটমট ক'রে বললেন, "শুনলে তো জয়ন্ত, শুনলে তো? তোমার নচ্ছার দুর্মুখ বন্ধুর কথা শুনলে তো? আমি ডেভিল?"

মানিক বললে, "আহাহা, খামোকা ক্ষেপে যান কেন সুন্দরবাবু? 'ডেভিল' বলতে কেবল ভূত, অসুর, শয়তান বোঝায় না, পাজি, নরপিশাচ, বিশ্বাসঘাতককেও ডেভিল বলে।"

সুন্দরবাবু রুদ্ধরোষে দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বললেন, "তাই নাকি? তাহ'লে তোমার মতে আমি ওর মধ্যে কোন্‌টি?"

মানিক সুন্দরবাবুর নাগালের বাইরে স'রে ব'সে বললে, "আবার নতুন কৌঁসুলি বা ব্যারিস্টারকেও ডেভিল নামে ডাকা হয়। একরকম খাবারেরও নাম ডেভিল, তাও তো আপনার জানা আছে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "তোমাকে আর শেখাতে হবে না, ডেভিল আমি অনেক খেয়েছি, মাংসের পুর দেওয়া ডিমের কথা কে না জানে!"

মানিক বললে, "উঁহু, সে ডেভিল নয়, এ হচ্ছে আর একরকম খাবার, বোধহয় আপনি কখনো খাননি—আমাদের মধু রাঁধতে জানে।"

বরাবরের মত আজও নতুন খাবারের নামে সুন্দরবাবুর ঘনীভূত ক্রোধ দ্রবীভূত হবার উপক্রম করলে। কারণ জয়ন্তদের খানসামা মধু যা রাঁধতে পারে, তিনিও যে

তা ভোজন করতে পারেন, সে কথাটা ভোজনবিলাসী সুন্দরবাবুর অজানা ছিল না। বেশ-একটু নরম হ'য়ে তিনি বললেন, "খাবারটা কি শুনি ?"

—"খুব মসলা-দেওয়া ভাজা মাংস বলতেও ডেভিল বোঝায়। খাসা খাবার। আস্বাদ নেবার ইচ্ছা আছে নাকি ? মধুকে ডাকব ?"

এর পর আর ক্রোধ প্রকাশ করা মনুষ্যোচিত নয়। সুন্দরবাবু বিগলিত কণ্ঠে বললেন, "আহা, তা মন্দ কি ?"

মানিক কত সহজে সুন্দর-বাবুকে চটাতে ও পটাতে পারে তাই দেখে জয়ন্ত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

"হুম্! কি প্রবাদ ?" [পৃষ্ঠা ৪২

এমন সময়ে মধুর প্রবেশ।

সুন্দরবাবু আহ্লাদিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"এই যে মধু! ঠিক সময়েই এসেছ হে—স্বাগত, স্বাগত!"

এমন অভাবিত অভ্যর্থনার কারণ বুঝতে না পেরে মধু জিজ্ঞাসু চোখে জয়ন্তের দিকে তাকালে।

জয়ন্ত বললে, "মধু, তোমাকে দেখে সুন্দরবাবু বলছেন—স্বাগত, অর্থাৎ তোমার আগমন শুভ হোক। কেন, তা শুনতে চাও ?"

মধু বললে, "তা শুনব না কেন ? কিন্তু তার আগে ব'লে রাখি, একটি ছোকরা-বাবু আপনার সঙ্গে জরুরী দরকারে দেখা করতে এসেছেন।"

—"ছোকরাবাবু ? জরুরী দরকারে ? কোথায় ?"
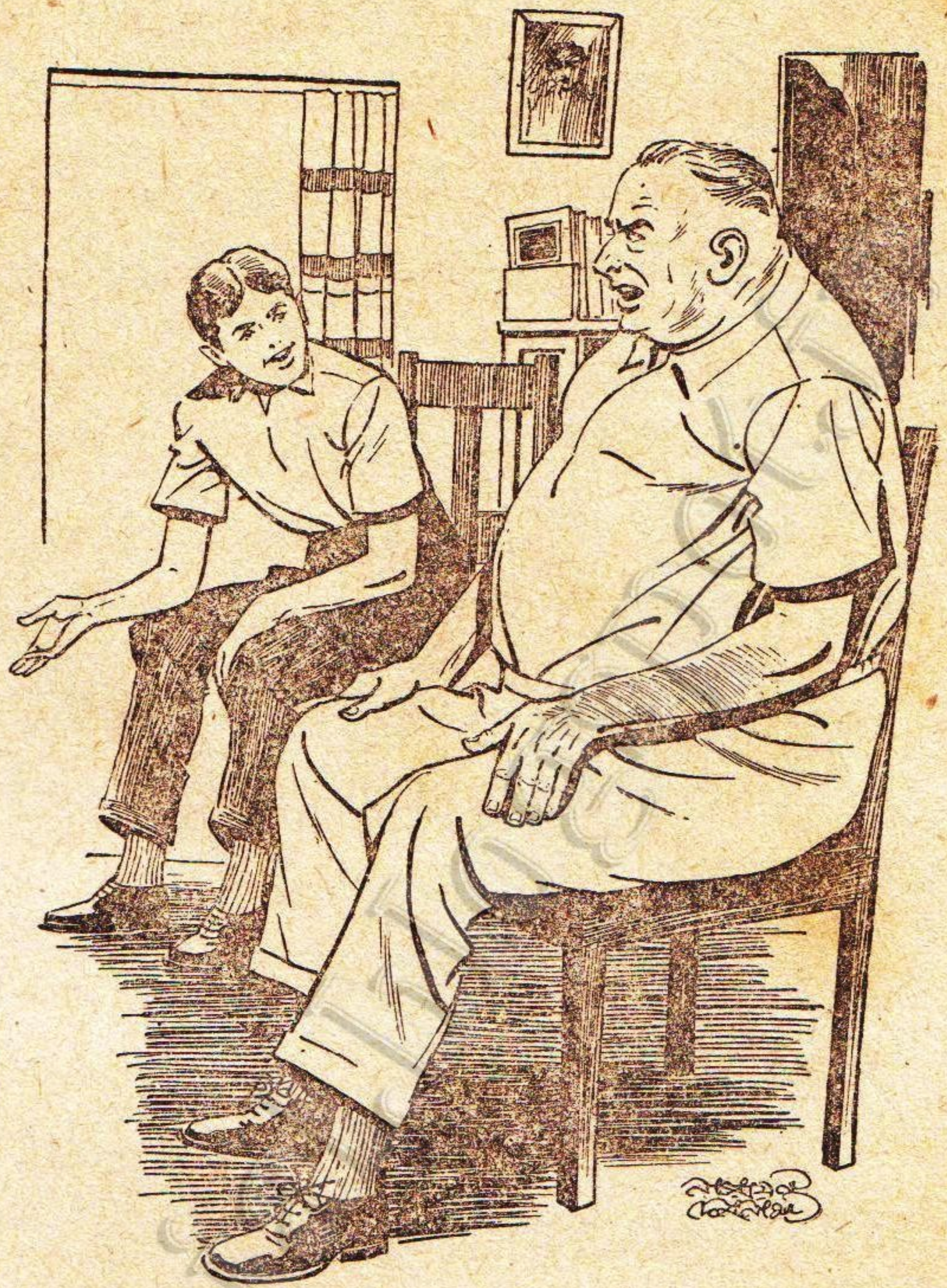
—"নীচেয়। মস্ত একখানা মোটর গাড়ি ক'রে এসেছেন। বড়লোকের ছেলে—জামায় মুক্তোর বোতাম, হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে সোনার আংটি।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "শ্রীমধুসূদন, একনজরেই এতটা লক্ষ্য ক'রে ফেলেছ? আমাদের সহবাসে তুমিও একটি ক্ষুদ্র গোয়েন্দা হ'য়ে উঠেছ দেখছি। যাও, বাবুটিকে উপরে পাঠিয়ে দাও।"

মধুর প্রস্থান। মানিকের মুখের পানে সুন্দরবাবুর হতাশভাবে দৃষ্টিপাত।

মানিক আশ্বাস দিয়ে বললে, "মাভৈঃ! মধু তো বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করছে না, যথাসময়েই আমাদের আরজি পেশ করব।"

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে একটি সুবেশী সুশ্রী যুবক, তার বয়স বাইশ-তেইশের বেশী হবে না, চোখের সপ্রতিভ দৃষ্টি দেখলেই বোঝা যায়, জনতার ভিতরেও সে নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই যুক্তকরে নমস্কার ক'রে সে বললে, "আমি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

জয়ন্ত বললে, "আমিই জয়ন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার পরিচয় জানবার সুযোগ আমার হয়নি।"

যুবক বললে, "আপনি চন্দ্রনাথ অ্যাণ্ড কোম্পানির নাম শুনেছেন?"

—"শুনেছি বৈকি! বিখ্যাত চা-ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠান।"

—"কেবল চা নয়, আমাদের প্রতিষ্ঠান আরো অনেক কিছু নিয়ে কারবার করে। চন্দ্রনাথ আমার ঠাকুরদার নাম। বর্তমানে আমি সেই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মালিক। আমার নাম বীরেন্দ্রকুমার বাগচী।"

—"বসুন বীরেনবাবু। আপনি আমার কাছে এসেছেন কেন?"

—"গোলকধাঁধায় প'ড়ে।"

—"কি রকম?"

—"আমাদের বাড়িতে হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে, যার মধ্যে অর্থ বা অনর্থ কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। অথচ বেশ বুঝতে পারছি যে এর সঙ্গে আছে কোন বিচিত্র রহস্যের সম্পর্ক!"

জয়ন্ত বললে, "বীরেনবাবু, আপনি আমার কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত ক'রে তুললেন।

বোঝা যাচ্ছে, যে ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন তা খুন বা ডাকাতি বা চুরি-চামারি নয়, কারণ ওদের মধ্যে অর্থ আর অনর্থ দুইই থাকে। কিন্তু রহস্যের সম্পর্কটা কোথায়, বুঝতে পারছি না।"

বীরেন মাথা নেড়ে বললে, "আমিও পারছি না। তাইতো বললুম আমি গোলকধাঁধায় পড়েছি। শোনা আছে ধাঁধার জবাব দেওয়া আপনার পেশা—"

"আমি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" [পৃষ্ঠা ৪৪

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "ভুল বীরেনবাবু, ভুল! ধাঁধার জবাব দেওয়া আমার পেশা নয়, আমার নেশা—অর্থাৎ আমার শখ!"

—"বেশ, তাই! ভ্রম-সংশোধনের জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়া ক'রে আমার কথা শুনবেন কি?"

—"নিশ্চয়ই! দয়া না ক'রেও শুনব। বলুন আপনার কাহিনী।"

বীরেন চেয়ারের উপরে নড়েচড়ে ভালো ক'রে ব'সে তার কাহিনী শুরু করলে ঃ

"কারবারের জন্যে আমাকে কলকাতাতেই বাস করতে হয় বটে, কিন্তু আমার পৈতৃক বসতবাড়ি বা বাস্তুভিটা আছে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অনতিদূরে। নবাবী আমলে তৈরী সেকেলে মস্তবড় বাড়ি, এখন সংস্কার অভাবে সদরমহল ছাড়া প্রায় সবটাই অব্যবহার্য হ'য়ে প'ড়ে আছে। কালেভদ্রে আমাদের কারুর দেশে যাবার শখ হ'লে কেবল সদরমহলটাই ব্যবহার করা হয়, কাজেই সেদিকটায় মাঝে মাঝে রাজমিস্ত্রীদের হাত পড়ে। অন্য সময়ে সদরমহলও তালাবন্ধ থাকে। বাড়িখানা স্থানীয় এক ভদ্রলোকের জিম্মায় আছে—সম্পর্কে তিনিও আমাদের কুটুম্ব।
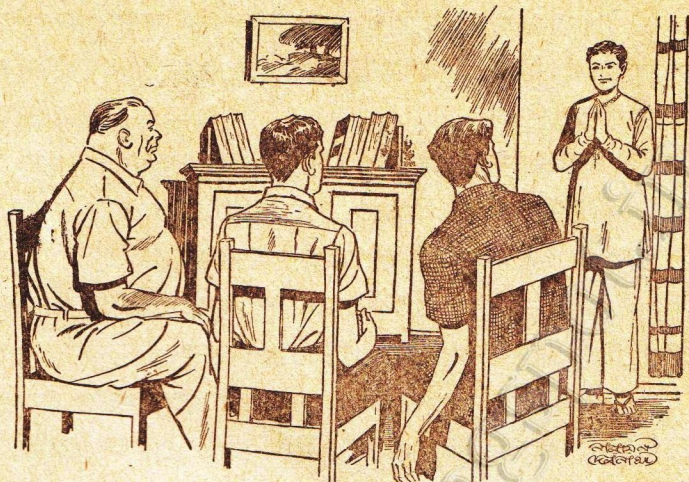
দিনদশেক আগে যদুনাথ বসু নামে এক ভদ্রলোক কলকাতার আপিসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে জানালেন, মাসতিনেকের জন্যে তিনি আমাদের দেশের বাড়ি ভাড়া নিতে চান।

আমি রাজী হলুম না। কিন্তু যদুবাবু অতিশয় জেদাজেদি করতে লাগলেন। বললেন তিনি মাসিক পাঁচশত টাকা হিসাবে তিন মাসের দেড় হাজার টাকার অগ্রিম ভাড়া আমার হাতে জমা দিতে প্রস্তুত আছেন।

আমি বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম, পাড়াগাঁয়ে একখানা সেকেলে বাড়ির জন্যে তিনি এত টাকা ভাড়া দিতে চান কেন?

তখন তাঁর মুখ থেকেই জানতে পারলুম, তিনি হচ্ছেন পূর্ববঙ্গের জমিদার। চিকিৎসার জন্যে রুগ্ণ মাকে নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়েছেন, মাকে নিয়ে যেতে মফস্বলের গঙ্গার ধারে কোন জায়গায়।

আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে বটে, কিন্তু যুক্তিটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'ল। কলকাতার আরো কাছে গঙ্গার ধারে তো কত ভালো ভালো বাড়ি রয়েছে। যাক্, এ-সব নিয়ে আমি আর বেশী মাথা ঘামালুম না। এই লোভনীয় প্রস্তাবে রাজী হ'য়ে গেলুম। যদুবাবু আমাকে দেড় হাজার টাকার একখানা চেক দিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে চ'লে গেলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে আর এক ব্যাপার! একখানা বেনামা চিঠি পেলুম। তাতে জানানো হয়েছেঃ প্রতাপ চৌধুরীকে যেন মুর্শিদাবাদের বাড়ি ভাড়া দেওয়া না হয়, সে সাংঘাতিক লোক।

সবিস্ময়ে ভাবতে লাগলুম, বাড়ি ভাড়া নিয়েছে তো যদুনাথ বসু, কিন্তু কে প্রতাপ চৌধুরী? আর এই বেনামা চিঠিই বা কে লিখলে? কেন লিখলে? আমি যে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছি, এ কথাই বা সে কেমন ক'রে জানতে পারলে?

তিন দিন পরে বিস্ময়ের উপরে বিস্ময়! যেদিন চেক পেয়েছিলুম তার পর দিন থেকেই দুর্গাপূজার জন্যে ব্যাঙ্ক বন্ধ ছিল, চেক ভাঙাতে পারিনি। ব্যাঙ্ক খুললে পর জানতে পারলুম আমাকে একখানা ভুয়ো চেক দেওয়া হয়েছে, যদুনাথ বসুর নামে ব্যাঙ্কে এক পয়সাও জমা নেই!

এভাবে ঠ'কে রেগে আগুন হ'য়ে আমি দেশে রওনা হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে

দেখলুম আমাদের বসতবাড়িতে জনপ্রাণী নেই! শুনলুম কয়েকজন গুণ্ডার মত লোক সেখানে দু'দিন ধ'রে খুব হৈ-হল্লা ক'রে আবার কখন স'রে পড়েছে কেউ তা জানে না!

বাড়ির একটা তালাবন্ধ ঘরে ঠাকুরদার আমলের কতকগুলো আসবাবপত্তর একালে অব্যবহার্য ব'লে গুদামজাত করা ছিল। সেই সঙ্গে একটা দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা প্রকাণ্ড আলমারির ভিতরে ছিল একগাদা সেকেলে কেতাব ও কাগজপত্র। কারা তালা ভেঙে সেই ঘরে ঢুকে কেতাব ও কাগজপত্রগুলো বার ক'রে ঘরময় ছড়িয়ে ফেলে রেখে গিয়েছে! নিশ্চয় যদুদেরই কীর্তি!

ঠাকুরদার হাতে লেখা একখানা ছেঁড়া খাতাও পেয়েছি। তাতেও সব অদ্ভুত কথা লেখা! বোধহয় ঠাকুরদার গল্প-টল্প লেখার অভ্যাস ছিল! খালি গল্প নয় পদ্যও!"

(ক্রমশঃ)

সখের গোয়েন্দা নিশীথ রায়

তুষারকান্তি চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব চিত্র কাহিনী)

সখের গোয়েন্দা নিশীথ রায় ও তার বন্ধু তরুণ সেন অনেক চুরি-ডাকাতির কিনারা করে পুলিসমহলে বেশ নাম করেছে। একবার তিমি ধরতে তারা জাহাজে দক্ষিণমেরুর দিকে যাত্রা করে। জাহাজ দক্ষিণমেরুর কাছে কোন এক জায়গায় নঙ্গর করলে নিশীথ ও তরুণ ক্যাপটেনের অনুমতি নিয়ে মোটর বোট চালিয়ে কিছু দূর দেখে আসবে বলে বেরিয়ে পড়ল।

খানিক দূর চলে যাবার পর তারা একটা বরফের পাহাড় দেখতে পেলে। তরুণ বোটটা চালাচ্ছিল। হঠাৎ বোটটা অচল হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে জলের তলায় তলিয়ে যেতে শুরু করলে…

তারা বোট ছেড়ে জলের উপর লাফিয়ে পড়ার আগেই তাদের নিয়ে বোটটা জলের তলায় তলিয়ে গেল। জলের নীচে নিশীথ ও তরুণের জ্ঞান হতে তারা বিস্ময়ে অবাক হয়ে দেখলে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে তারা শুয়ে আছে। এমন সময়ে দরজা খুলে অদ্ভুত পোশাক পরা একটা লোক তাদের সামনে এসে বললে, আমাদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্যে ক্ষমা করবেন…

নিশীথ ও তরুণ লোকটির অনুরোধে তার পেছন পেছন পথে বেরিয়ে বিস্ময়ে দেখলে অমাবস্যার রাতেও আকাশে চাঁদ রয়েছে…গাড়িগুলি পথে বিনা চাকায় চলছে…

তাদের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল যখন তারা একজন লোকের মুখে শুনলে, এটা পৃথিবী নয়…

কৌতূহলে তাদের মনটা ছটফট করতে লাগল…ব্যাপারটা কি রে বাবা…

এর পর ছবি দেখ।

জগৎশেঠের রত্নকুম্ভ
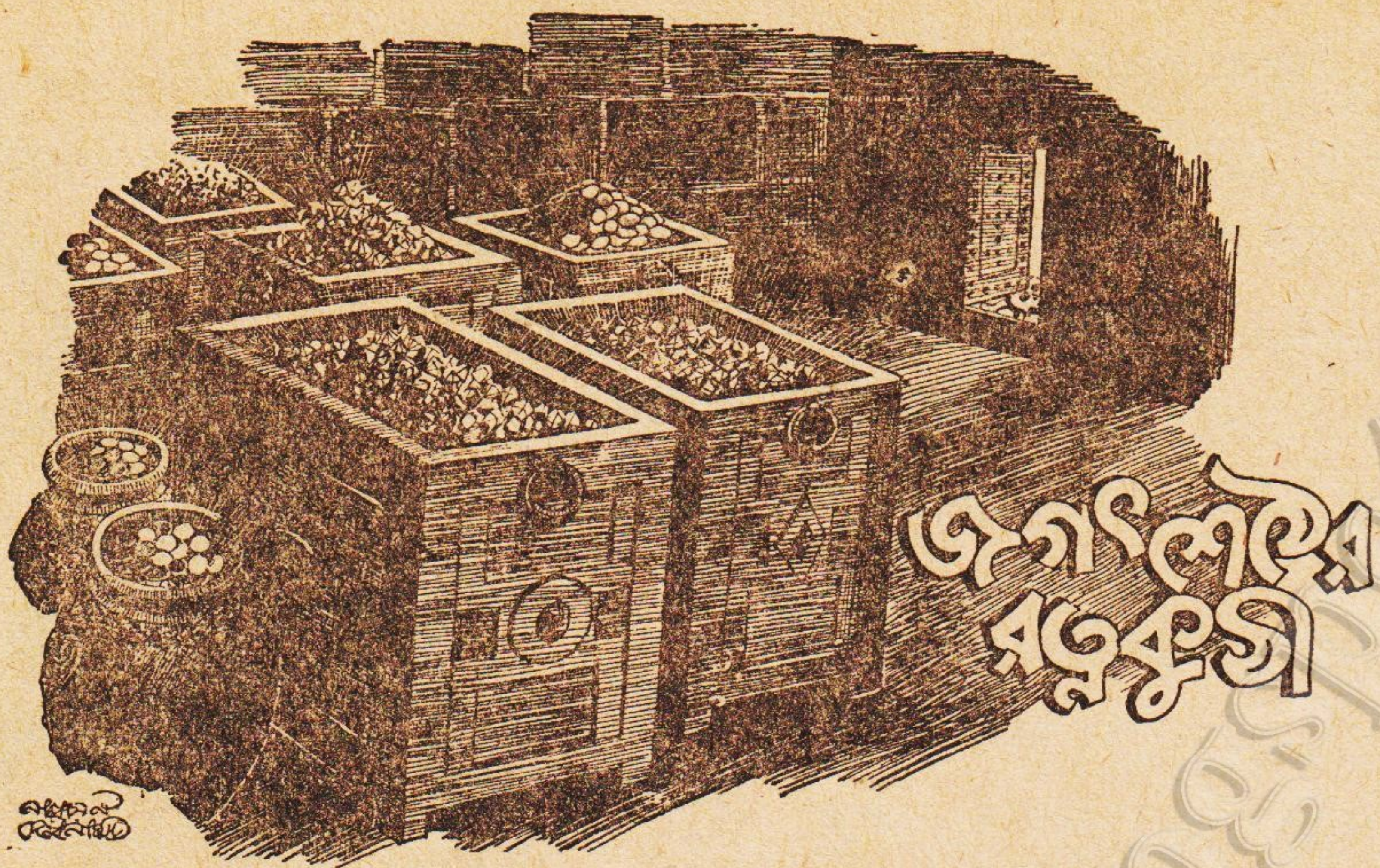
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

দ্বিতীয় অধ্যায়
নরকঙ্কাল ও ভীষণ গর্জন

(পূর্বানুবৃত্তি)

বীরেন চুপ করলে। জয়ন্তও স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল।

সুন্দরবাবু বললেন, "ভারি গোলমেলে ব্যাপার তো! খামোকা যদু নামধেয় ব্যক্তির আবির্ভাব, অকারণে দেড় হাজার টাকা অগ্রিম দাদন দিয়ে তিন মাসের জন্যে একখানা পাড়াগেঁয়ে সেকেলে বাড়ি ভাড়া নেওয়া, ভুয়ো চেক ঘাড়ে চাপানো, তারপর দু'দিন সেই বাড়িতে কাটিয়েই ফুড়ুৎ ক'রে হঠাৎ পলায়ন, এ সবই যেন মহা· পাগলামির কাণ্ড! বীরেনবাবু, আপনি কোন আস্ত পাগলের পাল্লায় পড়েছিলেন, এ নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করবেন না।"

মানিক বললে, "কিন্তু আমার মন কেমন খুঁত-খুঁত করছে! সন্দেহ হচ্ছে এত সহজে ব্যাপারটা বোধহয় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কেন, তোমার সন্দেহের কারণ কি?"

—"যদুর দল তালা ভেঙে বাড়ির বন্ধ ঘরে ঢুকেছিল কেন? আলমারি থেকে কেতাবগুলো টেনে বার করেছিল কেন? নিশ্চয় তারা কিছু খুঁজছিল!"

জয়ন্ত বললে, "আমিও মানিকের কথায় সায় দি। যদু আলমারির ভিতরে

হস্তচালনা করেছিল একটা কিছু খোঁজবার জন্যেই। কেবল আলমারি কেন, খুব সম্ভব সে বাড়ির অন্যান্য ঘরেও খোঁজাখুঁজি করতে ছাড়ে নি।"

বীরেন বললে, "কিন্তু বাড়ির অন্যান্য ঘরে এমন কিছুই ছিল না, যা দেখে চোরের লোভ হ'তে পারে। আলমারির বইগুলো নিয়ে ছেলেবেলায় আমিও ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। তার মধ্যে ছিল বটতলায় ছাপা কতকগুলো সেকেলে বই—আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, চাহার দরবেশ, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা প্রভৃতির সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত আর ঐ শ্রেণীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ আর তাড়া তাড়া বাজে কাগজপত্র। ব্যাস্, আর কিছুই নয়!"

...খাতা বার ক'রে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে। [পৃষ্ঠা ১৩৬

জয়ন্ত বললে, "ঐ সঙ্গে আপনার ঠাকুরদার নিজের হাতে লেখা একখানা খাতাও ছিল বললেন না?"

—"হ্যাঁ, ছিল। ছেলেবেলায় সেকেলে জড়ানো হাতের লেখা পড়বার আগ্রহ হয় নি, সম্প্রতি প'ড়ে দেখেছি। খাপছাড়া খোশগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্প্রতি আরো একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। খাতাখানা আগে ছেঁড়া ছিল না, এখন দেখছি মাঝখান থেকে একখানা কাগজ কে ছঁড়ে নিয়েছে।"

—"কি ক'রে বুঝলেন?"

—"পত্রাঙ্ক দেখে।"

জয়ন্ত বললে, "সন্দেহজনক, সন্দেহজনক! বীরেনবাবু, খাতাখানা একবার দেখতে পেলে ভালো হ'ত।"

নিজের হাতব্যাগের মধ্যে হস্তচালনা ক'রে বীরেন বললে, "অনায়াসেই দেখতে পারেন। যদি কাজে লাগে এই ভেবে সেখানা আমি সঙ্গে ক'রেই এনেছি"—এই ব'লে এক্সার্সাইজ বুকের আকারে বাঁধানো একখানা পাতলা খাতা বার ক'রে জয়ন্তের হাতে সমর্পণ করলে।

জয়ন্ত খাতাখানা খুলে আগাগোড়া পাতা উলটে প্রথমে ভাসা ভাসা চোখ বুলিয়ে গেল। টানা টানা জড়ানো লেখা, কিছু কষ্ট ক'রে পড়তে হয়। সে বললে, "দেখ মানিক, ৪০ পত্রাঙ্কে খাতা শেষ। বিষয়বস্তু দেখছি পাঁচ অংশে বিভক্ত। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা বা ভূমিকার মত একটুখানি অংশ। তার পরের অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'আভাস'। তৃতীয় অংশে কি ছিল জানবার উপায় নেই, ২১ থেকে ২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অংশের নাম 'ইতিহাস'। পঞ্চম অংশে 'উপসংহার'—একটি পুঁচকে পদ্য বা ছড়া। এখন আগে ভূমিকাটুকু শোনো।"

জয়ন্ত পড়তে লাগল ঃ

"যেখানে ঘটনাক্ষেত্র, তার নাম এখানে বলব না, লেখায় প্রকাশ করলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। আমার সঙ্গী কৈলাস চৌধুরী এখন পরলোকে বটে, কিন্তু তার কুচরিত্র পুত্র ইহলোকে বিদ্যমান থেকে কেমন ক'রে কিছু আভাস পেয়ে আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত ক'রে তুলেছে, এমন কি আমাকে ভয় দেখাতেও ছাড়ছে না। আমার একমাত্র ইচ্ছা, সমস্ত গুপ্তকথা জানবে কেবল আমার পুত্র। যদি সে কখনো অভাবে পড়ে এই গুপ্তকথা তার কাজে লাগবে, তার দুশ্চিন্তা দূর করবে। অন্তিমকাল উপস্থিত হ'লে সমস্ত গুপ্তকথাই তার কাছে ব্যক্ত করব। যদি সে সময় না পাই, তাহ'লেও আমার বিশেষ ভাবনার কারণ নেই। আমার পুত্র বুদ্ধিমান, তার জন্যেই তোলা রইল এই খাতাখানা। এই বিবরণ মন দিয়ে পাঠ করলেই সমস্ত রহস্য সে সমাধান করতে পারবে।"

পড়া থামিয়ে জয়ন্ত শুধোলে, "বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদাকে আপনি দেখেছেন ?"

—"আমার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁকে ছায়া ছায়া মনে পড়ে মাত্র।"

—"আপনার বাবার মুখে আপনি এই খাতাখানার কথা শোনেন নি ?"

বীরেন সকৌতুকে হেসে উঠে বললে, "বাবা? আমার বাবা পড়বেন গল্পের পাণ্ডুলিপি? মশাই, বাবাকে আমি জীবনে কোন ছাপানো নভেলের পাতাই ওলটাতে দেখি নি! নিজের কারবারের বাইরে আর কোন কথাই তাঁর মনে ঠাঁই পেত না।"

জয়ন্ত আবার কিছুক্ষণ ধ'রে চুপ ক'রে কি ভাবতে লাগল। তারপর বললে, "আচ্ছা বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদা মৃত্যুর আগে বা মৃত্যুশয্যায় আপনার বাবাকে এই খাতা সম্বন্ধে কোন কথা ব'লে যান নি?"

সজোরে মাথা নেড়ে বীরেন বললে, "কিছু না, কিছু না! মশাই, ঐ খাতার ভিতরে ঠাকুরদার নিজের কোন কথাই নেই, ওর সবটাই হচ্ছে ডাহা গালগল্প! আর মৃত্যুশয্যায় ঠাকুরদা কোন কথা ব'লে যাবেন কি, মরবার সময়ে তিনি কোন কথা বলবার অবসরই পান নি।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে হচ্ছে, ঠাকুরদা তাস খেলতে খেলতে হঠাৎ বুকের অসুখে মারা পড়েছিলেন। খেলার আসর থেকে তুলে তাঁর মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।"

জয়ন্ত নিজের রূপোর শামুকদানি থেকে একটিপ নস্য নিয়ে খুশী গলায় বললে, "খানিকটা আবছা কাটল ব'লে মনে হ'চ্ছে। হৃদ্‌রোগে হঠাৎ মৃত্যু, কোন কথা বলাই সম্ভব হয় নি—বটে, বটে, বটে!"

বীরেন কৌতূহলী কণ্ঠে বললে, "আপনি কি বলতে চান জয়ন্তবাবু?"

জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বললে, "আপাতত আপনার কৌতূহল চরিতার্থ করবার সময় হয় নি। এখন খাতার দ্বিতীয় অংশে কি 'আভাস' পাওয়া যায় দেখা যাক।" সে আবার পাঠ শুরু করলেঃ

"বাল্যকালে আমার জীবনে ঘটেছিল একটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রতিবেশীদের মধ্যে আমার সব চেয়ে দহরম-মহরম ছিল কৈলাস চৌধুরীর সঙ্গে। সে ছিল আমার নিত্য সঙ্গী—খেলাধুলায় ও আহারে-বিহারে আমরা সর্বদাই মানিক-জোড়ের মত একসঙ্গে থাকবার চেষ্টা করতুম।

কৈলাসের সঙ্গে একবার তার মাতুলালয়ে বেড়াতে গেলুম। জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে দশ-বারো মাইল তফাতে। সেখানে আমরা হাটে-বাটে-মাঠে

ছুটোছুটি ক'রে, মার্বেল-ডাংগুলি খেলে ও গঙ্গার এপারে-ওপারে সাঁতার কেটে তিন দিন কাটিয়ে দিলুম মহা আনন্দে। তারপরেই ঘটল পূর্বোক্ত ঘটনা।

গাঁয়ের প্রান্তে একটা মাঠে একদল ছেলে ফুটবল খেলছিল। এদেশে ফুটবল খেলার রেওয়াজ তখন নতুন শুরু হয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে খেলা দেখতে লাগলুম।

হঠাৎ এক বিপত্তি! মাঠের একদিকে গঙ্গাতীরে ছিল একখানা ভাঙাচোরা পোড়ো বাগানবাড়ি। এবং তার পিছনে ছিল একটা জলশূন্য পুরানো ইঁদারা। ফুটবলটা ঝুপ্ ক'রে গিয়ে পড়ল একেবারে সেই ইঁদারার ভিতরে।

দড়ি ব'য়ে নেমে গেলুম ইঁদারার গহ্বরে।

তখন আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে বষণ্ণ হ'য়ে উঠেছিল চতুর্দিক। ইঁদারার ভিতরে নজর চলে না। ছেলের দল খানিক হইচই ক'রে মাঠ ছেড়ে চ'লে গেল।

আমি বললুম, 'কৈলাস, বলের জন্যে ওরা কাল সকালে নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তার আগে আমরাই আজ কুয়োয় নেমে বলটাকে তুলে আনব।'

কৈলাস শিউরে উঠে বললে, 'বাপ রে, এই অন্ধকারে? পাগল নাকি?'

চিরকালই সবাই আমাকে ডানপিটে ও বেপরোয়া ব'লে জানে। আমি কিন্তু একটুও দমলুম না, বললুম, 'বেশ, তোকে কুয়োয় নামতে হবে না, তুই খালি খানিকটা মোটা দড়ি আর একটা দেশলাই যোগাড় ক'রে আন দেখি! তুই কেবল উপরে দাঁড়িয়ে থাকবি, কুয়োর ভিতরে নামব একলা আমিই। ফাঁকতালে একটা আস্ত ফুটবল লাভ, এমন সুযোগ ছাড়তে আছে '

যেমন কথা, তেমনি কাজ। এল দড়ি ও দেশলাই। ভরসন্ধ্যাবেলায় দড়ি ব'য়ে নেমে গেলুম ইঁদারার গহ্বরে।

ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। পায়ের তলায় কি কতকগুলো খড়মড় খড়মড় ক'রে উঠল। দেশলাইয়ের প্রথম কাঠি জ্বেলে কেবল এইটুকু দেখলুম, ইঁদারার গায়ে গাঁথা রয়েছে একজোড়া হাতলওয়ালা লোহার দরজা। তারপর কাঠি নিবে গেল।

দ্বিতীয় কাঠি জ্বেলে নীচের দিকে তাকিয়েই সচমকে দেখি কতকগুলো মাংসহীন নরকঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে আমার পায়ের তলায়! তারপর আলো নেবার সঙ্গে সঙ্গেই শুনলুম যেন কোন অপার্থিব বিভীষণের মারাত্মক ফোঁসফোঁসানি!

সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। মনে হ'ল পরমুহূর্তেই সেই ভয়াবহ বিষাক্ত হিস্ হিস্ শব্দ যেন আমার চোখের সামনেই মূর্তিমান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে! কর্পূরের মত উবে গেল আমার সমস্ত সাহস, দারুণ আতঙ্কে বিহ্বল হ'য়ে প্রাণপণে দড়ি ধ'রে কোনরকমে উপরে এসে উঠলুম!

সব শুনে কৈলাস চোখ কপালে তুলে বললে, 'চুলোয় যাক্ ফুটবল! ওখানে আছে গুপ্তধন আর যকের পাহারা! গুপ্তধনের লোভে ওখানে গিয়ে যকের হাতে যারা মারা পড়েছে, তুই দেখেছিস তাদেরই কঙ্কাল!'

(ক্রমশঃ)

মা মেয়েকে অঙ্ক শেখাচ্ছেন

মা—মনে কর দাদাভাইয়ের সাতটা বিস্কুট থেকে তোকে পাঁচটা দিলো, তবে আর কটা রইল?

মেয়ে—এই দেখ মা উত্তর।

মা—হতভাগা মেয়ে! সাতটা থেকে পাঁচটা দিলে সাতটাই থাকে?

মেয়ে—পাঁচটা কি বলছ মা, একটাও দেবে না।

—শ্রীবান্ধবী সিংহ

জগৎশেঠের রত্নকুম্ভ
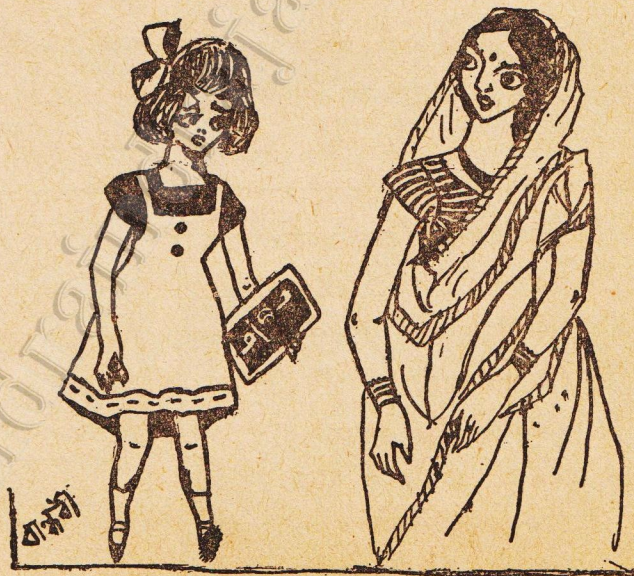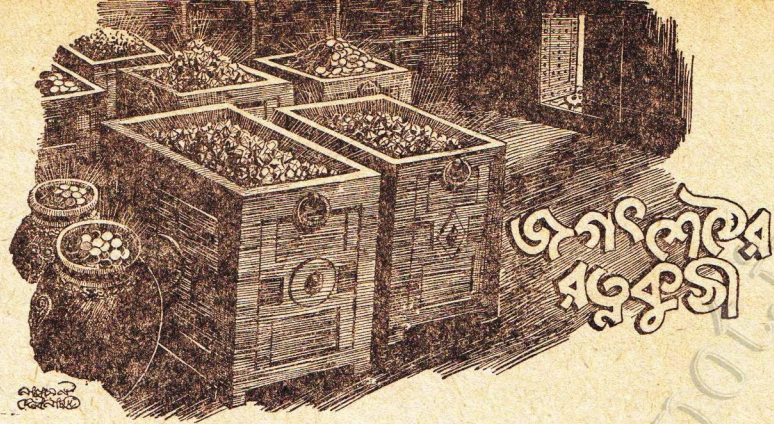
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

তৃতীয় অধ্যায়
জগৎশেঠের গুপ্তধন

(পূর্বানুবৃত্তি)

জয়ন্ত বললে, "খাতার দ্বিতীয় অংশ শেষ হ'ল। তৃতীয় অংশ আমাদের হাতে নেই। চতুর্থ অংশের নাম 'ইতিহাস'। এইবারে সেটুকু পাঠ করা যাক।"

আবার পড়া শুরু হ'ল ঃ

"সারা পৃথিবীকে যিনি ঋণদান করতে পারেন, তাঁরই উপযোগী উপাধি হ'চ্ছে 'জগৎশেঠ'। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ উপাধি দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের মহাজন ফতেচাঁদকে।

কিন্তু ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা হ'লেও বাঙালী ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষ হীরানন্দ শাহা সুদূর রাজস্থান থেকে পাটনায় এসে ব্যবসায় শুরু করেন এবং তেজারতী কারবারে প্রভূত সম্পত্তির মালিক হন।

হীরানন্দের সাত ছেলে। তাঁদের একজনের নাম মানিকচাঁদ। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার জন্যে বাংলার তখনকার রাজধানী ঢাকায় গিয়ে হাজির হন এবং নবাব-দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। পরে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ পশ্চিমবঙ্গে এসে ভাগীরথীতটে নূতন রাজধানী স্থাপন ক'রে নিজের নামানুসারে তার নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ। নবাবের প্রিয়পাত্র মানিকচাঁদও নূতন রাজধানীতে এলেন। নবাব-দরবারে তাঁর প্রভাব ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। তাঁর পরামর্শে মুর্শিদাবাদে

নবাবী টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি হন নবাবের অর্থসচিব ও কোষাধ্যক্ষ। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে 'শেঠ' উপাধি দান করেন।

এই মানিকচাঁদের বংশধররা পরে কেবল নবাব-বংশের নয় স্বাধীন বাংলাদেশেরও উত্থান ও পতনের অন্যতম কারণরূপে ইতিহাসে অমর হ'য়ে আছেন।

মানিকচাঁদ ছিলেন অপুত্রক। ভ্রাতুষ্পুত্র ফতেচাঁদ হন তাঁর দত্তকপুত্র। তিনি দিল্লীতে থেকে অংশীদাররূপে কারবার দেখতেন। কিন্তু ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মানিকচাঁদের মৃত্যু হ'লে তিনিও মুর্শিদাবাদে চ'লে আসেন। এর দুই বৎসর পরেই তিনি জগৎশেঠরূপে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ধনিক বা পুঁজিপতি ব'লে সুপরিচিত হন।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর (১৭২৭ খ্রীঃ) পর সুজাউদ্দীন নবাব হ'য়ে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সময়টাই হ'চ্ছে জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জীবনে সবচেয়ে গৌরব ও সৌভাগ্যের যুগ। তিনি কেবল সুবিপুল ধনাগারের অধিকারী ছিলেন না, নবাব-দরবারে ও দেশ-বিদেশে তাঁর সম্মান, খ্যাতি ও প্রতিপত্তিও ছিল অতুলনীয়। কিন্তু সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁর সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎশেঠকে প্রথম ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দিতে হ'ল।

তরুণ নবাব সরফরাজ ফতেচাঁদের পুত্রবধূর অসীম রূপলাবণ্যের কথা শুনে নির্বোধের মত তাঁকে স্বচক্ষে দেখবার বাসনা প্রকাশ করলেন,—এটুকু তাঁর খেয়ালে এলো না যে, হিন্দুদের অসূর্যম্পশ্যা কুলললনার পক্ষে সেটা হ'চ্ছে অতিশয় অপমানকর প্রস্তাব!

ফতেচাঁদ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে আলিবর্দী খাঁয়ের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হলেন এবং তার ফলে গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজের মৃত্যু ও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দীর সিংহাসনপ্রাপ্তি।

এই ঘটনার চার বৎসর পরে ফতেচাঁদ ইহলোক ত্যাগ করলেন। তাঁর দুই পৌত্র—মাধব রায় ও স্বরূপচাঁদ। মাধব রায় জগৎশেঠ উপাধির সঙ্গে বেশীর ভাগ সম্পত্তির অধিকারী হলেন এবং বাকি সম্পত্তির সঙ্গে স্বরূপচাঁদ নবাব-দরবার থেকে পেলেন 'রাজা' উপাধি। বাংলাদেশে তখন ইংরেজ ও ফরাসীরাও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন, সুচতুর জগৎশেঠরা তাঁদেরও লক্ষ লক্ষ টাকা ধার দিয়ে তুষ্ট রাখতে ভুললেন না। এইভাবে সব দিক সামলে ব্যবসা চালিয়ে তাঁরা দিনে দিনে অধিকতর

আর্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে চললেন।

তারপরেই আলিবর্দীর মৃত্যু ও ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজের সিংহাসন লাভ এবং তাঁর সঙ্গে জগৎশেঠের বিরোধ। নূতন নবাবের কাছে অপমান ও লাঞ্ছনা লাভ ক'রে জগৎশেঠ আবার মীরজাফর ও ইংরেজদের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ফল, পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজের পতন এবং বাংলার সর্বনাশ।

জগৎশেঠরা আবার পূর্ব-গৌরবের পদে উন্নীত হ'য়ে নিজেদের স্বর্ণভাণ্ডারের পরিধি আরো বাড়িয়ে তুললেন বটে, কিন্তু তখনই ভিতরে ভিতরে তাঁদের উপরে শনির দৃষ্টি পড়তে শুরু হ'ল। তারপর অকর্মণ্য মীরজাফরকে বঞ্চিত ক'রে ইংরেজরা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের ভার অর্পণ করলেন মীরকাশিমের হস্তে। নূতন নবাবকে নিয়ে জগৎশেঠরা সুখী হ'তে পারলেন না, তাঁরা আবার চক্রান্তে যোগ দিলেন। কিন্তু এবারে তাঁরা আর শেষ রক্ষা করতে ও নিয়তিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না, বিপদ ক্রমেই ঘনীভূত হ'য়ে উঠছে দেখে মীরকাশিম তাঁদের বন্দী ক'রে ফেললেন (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁদের বন্ধু ইংরেজদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা আর মুক্তিলাভ করতে পারলেন না।

তাঁর ঠাকুরদার গল্প বানানোর অভ্যাস ছিল!" [পৃষ্ঠা ১৭৬

তারপর উদয়নালার যুদ্ধ; মীরকাশিমের পরাজয় এবং জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দীদের নিয়ে মীরকাশিমের মুঙ্গেরে প্রস্থান; বক্সারের যুদ্ধ; মীরকাশিমের শেষ পরাজয় (১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) এবং জগৎশেঠ প্রভৃতিকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ ক'রে হত্যা।

মীরজাফর আবার বাংলার নবাব হন এবং নূতন জগৎশেঠ কুশলচাঁদও (নিহত জগৎশেঠ মাধব রায়ের বড় ছেলে) আবার ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। তিনিও ইংরেজদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য লাভ ক'রেও শেঠবংশের পূর্বগরিমা আর ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। বাংলার ভুয়ো নবাবীর সঙ্গে জগৎশেঠদেরও জাঁক-জমক ম্লান হ'য়ে এসেছিল, বাংলার স্বাধীনতাহরণে সাহায্য ক'রে তাঁরাও আত্মরক্ষা করতে পারলেন না।

বুদ্ধিমান কুশলচাঁদ বুঝে নিয়েছিলেন যে, জগৎশেঠদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়— তাঁদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। দুঃসময়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

তাঁর আদেশে একটি গুপ্ত কুঠী নির্মিত হ'ল এবং নিজের সম্পত্তির কতক অংশ তিনি সেইখানে লুকিয়ে রাখলেন।

সেই রত্নকুঠীর কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে, কিন্তু তার ঠিকানা কেউ জানে না। কুশলচাঁদ হঠাৎ মারা পড়েন, তাই গুপ্তধনের সন্ধান নিজের উত্তরাধিকারীর কাছে দিয়ে যেতে পারেন নি।

শেষ পর্যন্ত কুশলচাঁদ যা ভয় করেছিলেন তাইই সত্য হ'য়ে দাঁড়ায়। ক্রমেই শেঠদের অর্থ ও প্রতিপত্তি ক'মে এলেও কুশলচাঁদের মৃত্যুর পর আরো দুইজন জগৎ-শেঠের নাম শোনা যায়—হারেকচাঁদ ও ইন্দ্রচাঁদ।

ইন্দ্রচাঁদের পুত্র গোবিন্দচাঁদ 'জগৎশেঠ' উপাধি থেকেও বঞ্চিত হন এবং পিতার সম্পত্তিও বোকার মত দুই হাতে উড়িয়ে দিয়ে ইংরেজের অন্নদাসরূপে শেষ-জীবন কাটাতে বাধ্য হন। তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকেও দেশদ্রোহী জগৎশেঠদের কাছে উপকৃত ইংরেজরা বৃত্তি দান করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে বৃত্তিও বন্ধ হয়।

জগৎশেঠের আধুনিক বংশধররাও মুর্শিদাবাদে বাস করেন, কিন্তু লুপ্ত হয়েছে তাঁদের আর্থিক গৌরব। হয়তো তাঁরাও প্রবাদে গুপ্তধনের কাহিনী শ্রবণ করেন, কিন্তু তার সত্যতা নিরূপণ করবার উপায় তাঁদের হাতে নেই—আবিষ্কার করতে পারলে এখন এ গুপ্তধনের মালিক হবে যে কোন ব্যক্তি।"

জয়ন্তের পাঠ সাঙ্গ হ'ল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! সব তো শোনা হ'ল! খানিকটা ভণিতা, খানিকটা গালগল্প, খানিকটা গাঁজা-মেশানো ইতিহাস! বীরেনবাবু ঠিকই ধরেছেন—তাঁর ঠাকুরদার গল্প বানানোর অভ্যাস ছিল!"

জয়ন্ত বললে, "উপসংহারে একটি পদ্যও আছে, সেটাও চেঁচিয়ে পড়া যাক!" ব'লে সে পড়তে লাগল ঃ

বোকায় ধোঁকা দেবার তরে বুদ্ধিসাগর মন্ত্রি'
গোলকধাঁধার গ্রন্থ রচি আমি নতুন গ্রন্থী।
কিন্তু আমি ঠিক জানি ভাই,
গুপ্তপথে রপ্ত সবাই!
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী।

*   *

বিন্দু বারি সিন্ধু হ'লে যায় না দেখা বিন্দুকে,
ইন্দু আছে মেঘের আড়ে, নিন্দে তবু নিন্দুকে।
মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সেই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে!

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "এ যে বাবা দস্তুরমত হেঁয়ালি!"

বীরেন বললে, "প্রায় অতি-আধুনিক কবিতার মত!"

মানিক বললে, "খাপছাড়া পদ্য-টদ্য নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাবার দরকার নেই। জয়ন্ত, তুমি কি মনে কর, বীরেন-বাবুর দেশের বাড়িতে যে রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে এই খাতার লেখার কোন সম্পর্ক আছে?"

জয়ন্ত বললে, "এইবারে তাই নিয়েই আলোচনা করতে হবে।"

মধু একখানা খাম হাতে ক'রে ঘরে ঢুকে বললে, "বাবু, একটা অদ্ভুত লোক এসে আপনার নামে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।"

—"অদ্ভুত লোক?"
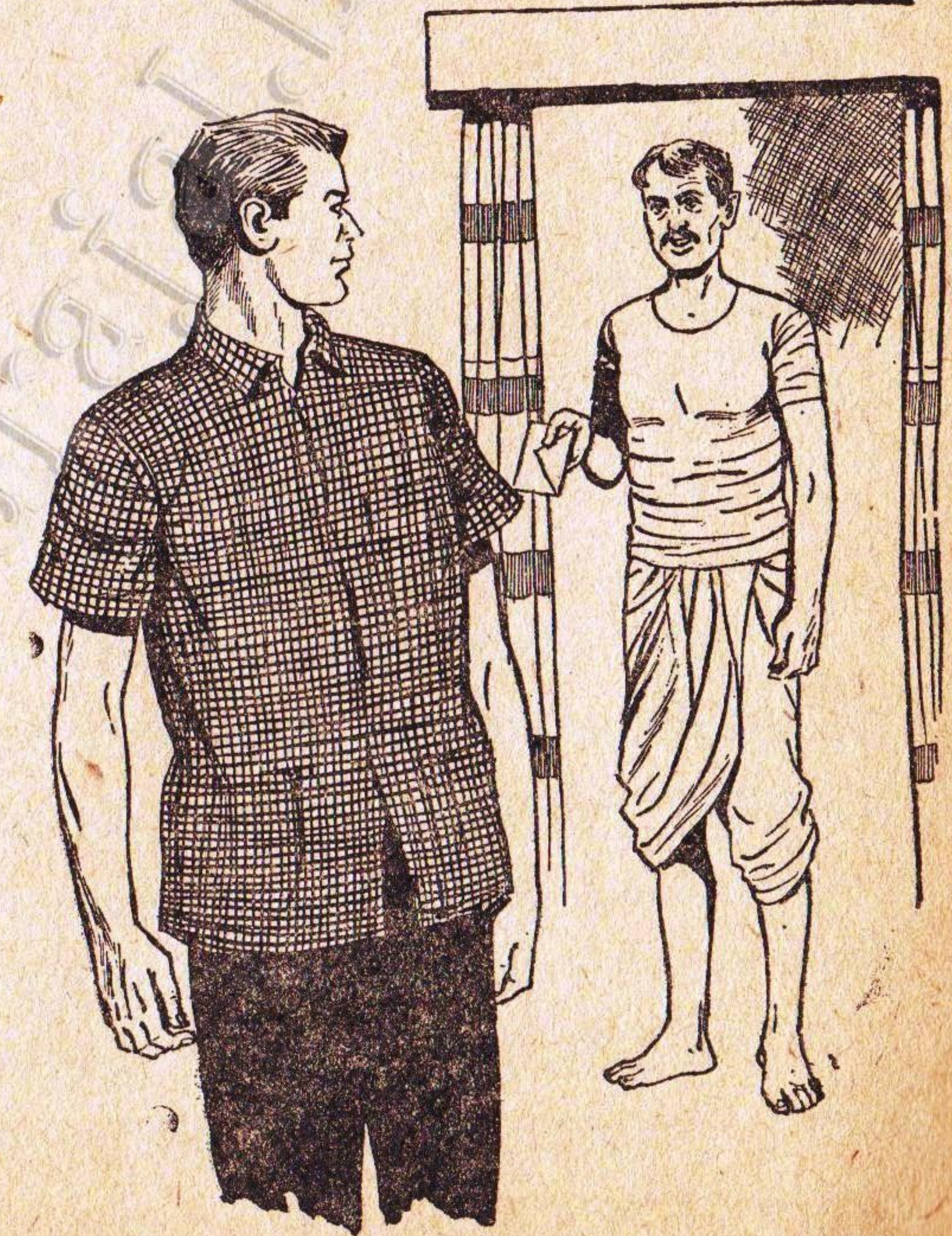
এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।"

—"হ্যাঁ বাবু। পরনে সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ।"

জয়ন্ত খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা প'ড়েই লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "কোথায় সে ?"

—"বাবু, চিঠিখানা আমার হাতে গুঁজে দিয়েই সে হনহন ক'রে চ'লে গেল !"

চিঠিতে কেবল লেখা ছিল, "সাবধান, সাবধান,—সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরীকে সাবধান !"

(ক্রমশঃ)

কোন জিনিসের গন্ধ আছে, কোন জিনিসের গন্ধ নেই কেন ?

ফুলের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় মুখ দিয়ে আপনিই একটা কথা বেরিয়ে পড়ে। বলি, বাঃ, কি সুন্দর গন্ধ ! যতটা পারি প্রশ্বাসটা টেনে নিই নাক দিয়ে যাতে গন্ধটা অনেকক্ষণ ধরে শুঁকতে পাই।

অথচ পচা মাছ বা নর্দমার কাছ দিয়ে যাবার সময়ে মুখ সিঁটকে বলি, উঁঃ, কি বদ গন্ধ রে বাবা ! প্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে নাকে চাপা দিয়ে সে স্থান দ্রুত ত্যাগ করি।

আবার এমন জিনিসও আছে যা থেকে ভাল মন্দ কোন গন্ধই পাই না।

কেমন এমন হয় বলতে পার ?

প্রথমে বুঝতে হবে আমরা গন্ধ পাই কি করে। আমাদের নাকের মধ্যে এমন কতকগুলি স্নায়ু আছে যাতে কোন বস্তুর সংস্পর্শ হলে আমরা গন্ধ পাই। দ্বিতীয়তঃ, সব দ্রব্যের মধ্যেই অণু আছে। সেই অণুর সূক্ষ্মতম বস্তু, আমাদের শাস্ত্রে বলে তন্মাত্র, সেগুলি সেই দ্রব্য থেকে সব সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সূক্ষ্মতম বস্তুগুলি নাকের স্নায়ুর সংস্পর্শে এলে স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর আমরা গন্ধ পাই।

কোন কোন বস্তুর নাকের স্নায়ু উত্তেজিত করার শক্তি নেই। যেমন—জল, বাতাস ইত্যাদি। এইগুলির সূক্ষ্ম বস্তুগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেও নাকের স্নায়ু উত্তেজিত করতে পারে না বলে আমরা গন্ধ পাই না।

জগৎশেঠের রত্নকুম্ভ
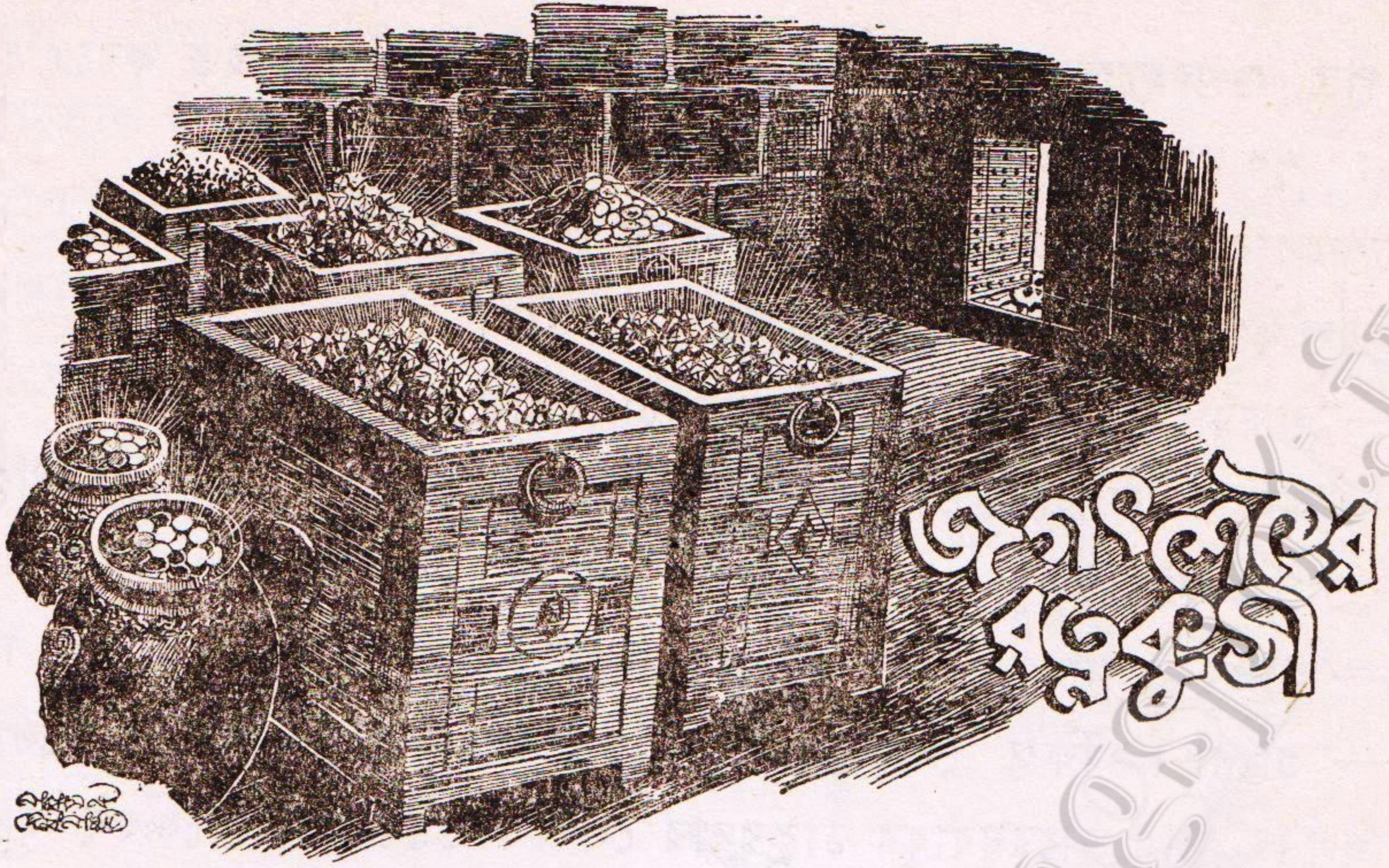
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

চতুর্থ অধ্যায়

কে প্রতাপ চৌধুরী ?

(পূর্বানুবৃত্তি)

মানিক বললে, "কি আশ্চর্য! কে এই সাক্ষাৎ-শয়তান প্রতাপ চৌধুরী ? বার বার তার কথা তুলে আমাদের সাবধান ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে কেন ?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আরো একটা অদ্ভুত প্রশ্ন হ'চ্ছে, কে এই অদ্ভুত লোকটা ? পরনে সন্ন্যাসীর মত গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়িগোঁফ !"

বীরেন বললে, "আমার বিশ্বাস, এই লোকটাই বেনামা চিঠি লিখে আমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিল।"

জয়ন্ত বললে, "এই গেরুয়াবস্ত্রধারী রহস্যময় লোকটা কে তা জানি না, কিন্তু প্রতাপ চৌধুরী সম্বন্ধে হয়তো কিছু আন্দাজ করতে পারি।"

বীরেন বললে, "পারেন নাকি ?"

—"হ্যাঁ। আমার আন্দাজ হয়তো মিথ্যা নয়। আপনার ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবুর লেখা প'ড়ে আমরা জেনেছি যে, তিনি যখন ইঁদারায় নেমেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন কৈলাস চৌধুরী। আর এক জায়গায় তিনি বলছেন, কৈলাস চৌধুরীর

কুচরিত্র পুত্র গুপ্তরহস্যের আভাস পেয়ে তাঁকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছে আর ভয় দেখাচ্ছে। খুব সম্ভব তারই নাম প্রতাপ চৌধুরী।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু গুপ্তরহস্যটা কি ?"

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বললে, "জগৎশেঠের রত্নকুঠী।"

—"আরে ধেৎ, তুমিও কি ঐ রূপকথাটা বিশ্বাস কর ?"

—"করি। জগৎশেঠ কুশলচাঁদের গুপ্তধনের কথা আমিও ঐতিহাসিক কাহিনীতে পাঠ করেছি।"

—"ইতিহাস আর কাহিনী এক কথা নয়।"

—"তা নয়। কিন্তু সেকালের ধনীদের মধ্যে গুপ্তধন রাখার প্রথাটা খুবই চলিত ছিল। আর বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা পড়লে এই সন্দেহই দৃঢ় হয় যে, তিনি গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন। তা নইলে তিনি এ কথা বলতেন না যে, লেখার মর্মোদ্ভেদ করতে পারলে তাঁর পুত্রের অর্থাভাব দূর হয়ে যাবে।"

মানিক বললে, "ধরলুম কৈলাস চৌধুরীর ছেলেরই নাম হ'চ্ছে প্রতাপ চৌধুরী। হয়তো সত্যসত্যই তার চরিত্র হ'চ্ছে সাক্ষাৎ-শয়তানের মত ভয়াবহ। কিন্তু তার সম্বন্ধে আমাদের সাবধান ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে কেন ? এ মামলাটা নিয়ে এখনো আমরা তদন্তে নিযুক্ত হই নি। সে আমাদের অস্তিত্ব জানতে পারবে কেমন ক'রে ?"

জয়ন্ত শুধোলে, "বীরেনবাবু, আপনি যে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করতে চান, এ কথা কি আর কারুর কাছে প্রকাশ করেছেন ?"

বীরেন সবেগে মাথা নেড়ে বললে, "নিশ্চয়ই নয়! আজ সকাল পর্যন্ত জানতুম না যে, আমি আপনাদের কাছে এসে ধরনা দেব!"

—"তাহ'লে অন্য কোন পক্ষের লোক আপনার পিছনে পিছনে ছায়ার মত লেগে আছে। আপনি যে আমাদের কাছে এসেছেন, এর মধ্যেই সে খবর তারা পেয়ে গেছে। জানেন তো, অপরাধীদের কাছে আমরা অপরিচিত নই ?"

বীরেন বললে, "এ কথায় আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না। কারা তারা ?"

—"হয়তো তথাকথিত যদুনাথ বসুর দল। হয়তো যদুনাথ হ'চ্ছে প্রতাপ চৌধুরীরই ছদ্মনাম!"

মানিক বললে, "যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরীর কথা বলতে পারি না, তবে

এমন আর একজন লোকও বীরেনবাবুর প্রত্যেক গতিবিধির খবর রাখে, যে প্রতাপ চৌধুরীর বন্ধু নয়।"

জয়ন্ত বললে, "তুমি বেনামা পত্রলেখকের কথা বলছ ?"

—"হ্যাঁ।"

—"আমিও তোমার মতে সায় দি। আমরা এখনো কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই নি, কিন্তু ব্যাপারটা যে গোড়াতেই অতিরিক্ত মাত্রায় ঘোরাল হ'য়ে উঠল! আপাততঃ আমাদের এই প্রতাপ চৌধুরী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। বীরেনবাবু, আপনি প্রতাপ চৌধুরীকে চেনেন ?"

টেবিলের উপরে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিয়ে…

—"না। তবে লোকের মুখে শুনেছি, চুরি, জুয়াচুরি, রাহাজানি, খুনখারাবিতে সে একজন অদ্বিতীয় ব্যক্তি। একবার কোথায় কি অপরাধ ক'রে সে পনেরো বছরের জন্যে জেলে গিয়েছিল, কিন্তু বছরখানেক যেতে না যেতেই জেল ভেঙে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে আছে।"

সুন্দরবাবু হঠাৎ টেবিলের উপরে প্রচণ্ড জোরে এক ঘুষি বসিয়ে দিয়ে ব'লে উঠলেন, "জয়ন্ত! মানিক! এই সেই 'সোনার আনারস' মামলার প্রতাপ চৌধুরী নয় তো ? আমরাই তাকে গ্রেপ্তার করেছিলুম, পনেরো বৎসর কারাবাসের আদেশ পেয়ে এক বছরের মধ্যেই জেল থেকে সে পালিয়ে যায় আর সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় তার দলের আর একজন লোককেও।"

মানিক বললে, "তারও নাম মানিকচাঁদ। সেও এক মারাত্মক অপরাধী, আমাদের প্রায় মৃত্যুমুখে পৌঁছে দিয়েছিল, সুন্দরবাবুর জন্যে কোনক্রমে প্রাণে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি!"

জয়ন্ত বললে, "হুঁ, সব মনে পড়ছে! প্রতাপ চৌধুরী সেই সময়েই আমাকে বলেছিল, কোন কারাগারই তাকে ধ'রে রাখতে পারবে না, তার সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে!"

মানিক বললে, "ও বাবা, সে যে এক মহা ধড়িবাজ ব্যক্তি! সেবারে তার হাত থেকে আমরা বাঘরাজাদের গুপ্তধন ছিনিয়ে নিয়েছিলুম। গ্রেপ্তার হবার পর সে আমাদের ব'লে গিয়েছিল—'আপাতত এই গুপ্তধন তোমাদের জিম্মায় রেখে গেলুম। যথাসময়ে এর সঠিক হিসাব দাখিল করতে হবে।' এখন সে জেলের বাইরে এসেছে। এইবারে আবার কি তার দেখা পাব?"
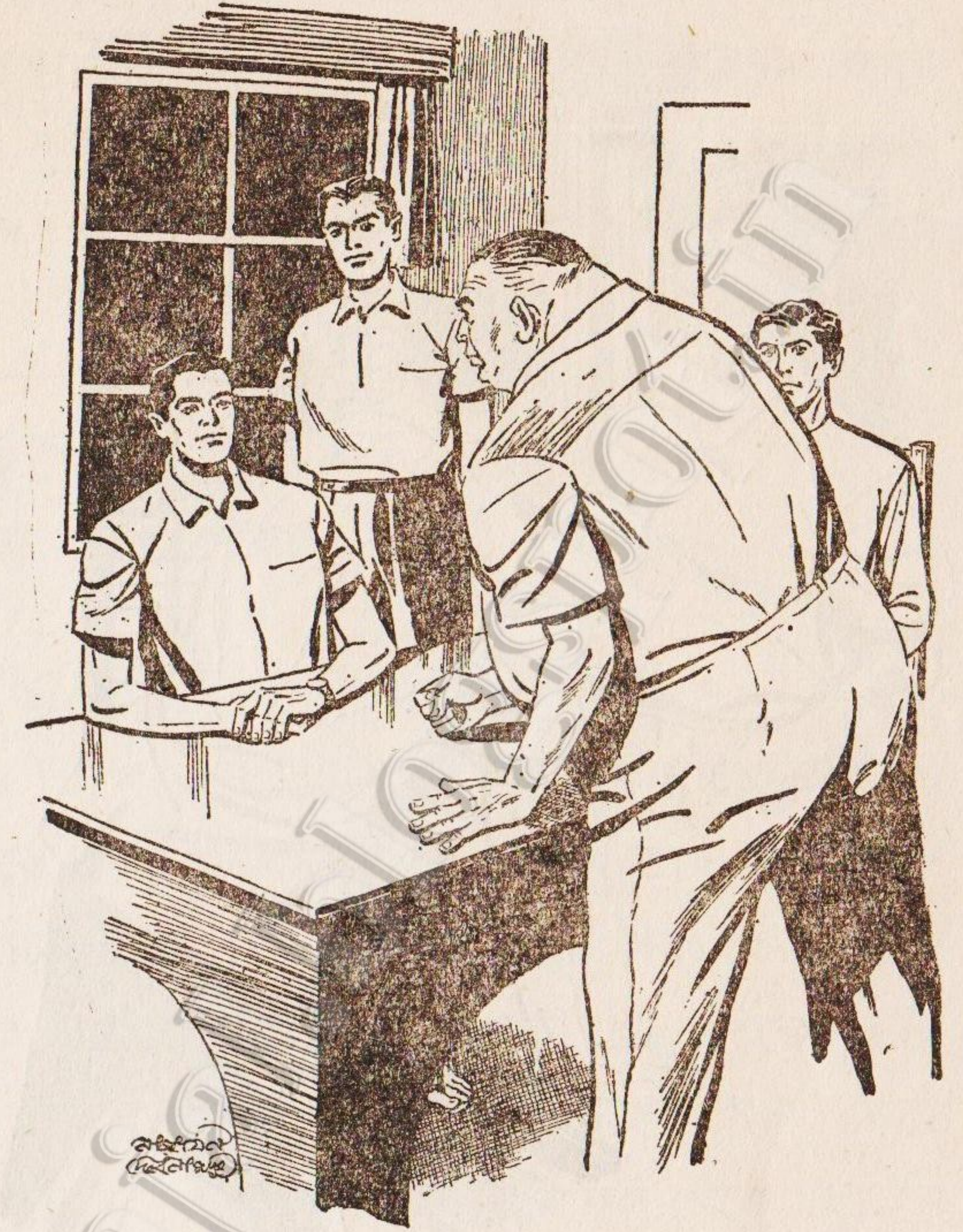
কি-একটা এসে প'ড়ে ছটকে গেল…

জয়ন্ত বললে, "সে আবার দেখা দেবে কি দেবে না জানি না। কিন্তু সে যদি এই প্রতাপ চৌধুরী হয়, আর আমরা যদি বীরেনবাবুর মামলার ভার গ্রহণ করি, তাহ'লে আমাদেরই তাকে খুঁজে বার করতে হবে।"

সুন্দরবাবু মস্তক আন্দোলন ক'রে বললেন, "হুম্! সে বুঝি সহজ কথা? গেলবারেই দেখেছি, প্রতাপ চৌধুরীটা মেঘনাদের মত আড়ালে থেকে এমন কায়দায় যুদ্ধচালনা করে যে, কেউ তাকে ধরতে ছুঁতে পারে না!"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু তার যুদ্ধচালনার কৌশলটা আমরা জেনে নিয়েছি, সুতরাং এবারে আর বেশী বেগ পেতে হবে ব'লে মনে হয় না।"

আচম্বিতে সকলকে চমকে দিয়ে রাস্তার ধারের জানালার গরাদের উপরে ঠকাং

ক'রে কি-একটা এসে প'ড়ে ছটকে গেল অন্য দিকে এবং পরমুহূর্তে জেগে উঠল কামানগর্জনের মত একটা কানফাটানো ভীষণ শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে থরথর ক'রে বাড়িঘর কাঁপতে লাগল! হুহু ক'রে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল সমস্ত দৃশ্য! সম্মিলিত কণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ! জনতার উচ্চ কোলাহল! এ যেন পরম শান্তির মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! (ক্রমশঃ)

গল্প হলেও সত্যি

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার

কাটা আঙুল জুড়তে পার?

তবে গঁদের আটা দিয়ে নয়, সত্যি সত্যি জুড়ে দিতে পারবে কি?

সেদিন ফ্রান্সের আগান (Agen) শহরে একটা মাংসর কারখানাতে একজন কর্মচারী মাংস কাটছিল। কাজের মাঝে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় তার মাংস-কাটা ছুরিটা পড়বি তো পড় একেবারে ঘ্যাচাং করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের পাশে তর্জনীতে এসে পড়ে। ঐ ভারী ছুরির আঘাতে মানুষের মাথাটা ধড় থেকে মুহূর্তমধ্যে আলাদা হয়ে যায়, আঙুল তো কোন্ ছার। সঙ্গে সঙ্গে সেটা কেটে দু'টুকরো হয়ে ছিটকে একপাশে পড়ে যায়। কাটা জায়গা দিয়ে কল থেকে বেরোন জলের মত হুহু করে রক্ত বার হতে থাকে। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হয় না। তখন এক ডাক্তারকে ডাকা হল। ডাক্তার এসে আঙুলের রক্ত বন্ধ করে দিলেন। কেবল তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন কাটা আঙুলটুকু খুঁজে নিয়ে আসতে।

লোকেরা খুঁজতে শুরু করলে। নাড়িভুঁড়ি নোংরা ময়লা ঘেঁটে কাটা আঙুলের টুকরোটুকু নিয়ে এসে ডাক্তারকে দিল। ডাক্তার মন দিয়ে আঙুলটুকু কাটা জায়গায় ঠিকমত বসিয়ে, সেলাই করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ওষুধ দিয়ে দিলেন।

তারপর আট দিন পরে যখন তিনি এসে ব্যাণ্ডেজ খুললেন, দেখা গেল যে কাটা আঙুল বেমালুম জুড়ে গেছে, তবে ভাল করে আঙুল নড়ান যায় না। যাহোক ডাক্তারের কাজ সার্থক হয়েছে শুনে আহত লোকটির কাছে পাড়ার লোকেরা ছুটে আসে। তার গল্প শুনে সকলেই ডাক্তারের প্রশংসা করে।

তোমরাও আঙুল জুড়তে পারবে যখন ডাক্তারী বিদ্যা পড়বে। ঠিক কি না বল?

জগৎশেঠের রত্নকুঠী
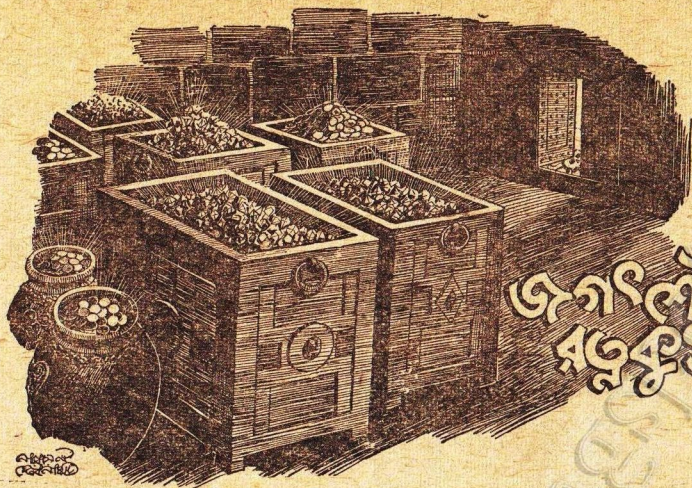
হেমেন্দ্রকুমার রায়

পঞ্চম অধ্যায় [অপ্রকাশিত উপন্যাস]

হোটেলখানায় সন্ন্যাসী

(পূর্বানুবৃত্তি)

এই অভাবিত ও আকস্মিক উৎপাত স্তম্ভিত ক'রে দিলে সকলের দেহ এবং মন। জানালা দিয়ে হুহু ক'রে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল বারুদের গন্ধমাখা রাশীকৃত ধোঁয়া, সকলে ফ্যালফ্যাল ক'রে সেইদিকে তাকিয়ে রইল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত।

বাহির থেকে সমানে ভেসে আসছে আর্তনাদ, হট্টগোল, বহু লোকের দ্রুত-পদশব্দ।

কে চাৎকার ক'রে বললে, "শীগ্‌গির ফোন ক'রে দাও! অ্যাম্বিউল্যান্সের ব্যবস্থা কর!"

সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিলে জয়ন্ত। দৌড়ে জানালার কাছে ছুটে গিয়ে পথের দিকে করলে দৃষ্টিপাত। এদিকে ওদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "বোমা! আমাদের জানালা লক্ষ্য ক'রে কেউ বোমা ছুঁড়েছে!"

সুন্দরবাবু চোখ পাকিয়ে ব'লে উঠলেন, "হুম! হুম্! হুম্!"

আমাদের জানালা লক্ষ্য করে কেউ বোমা ছুঁড়েছে!" [পৃষ্ঠা ৩৪৩

—"কিন্তু আমাদের জোর কপাল! বোমাটা ঘরের ভিতরেও আসেনি, জানালার গরাদের গায়ে ধাক্কা লেগেও তার বিস্ফোরণ হয়নি, পথের উপরে আছড়ে পড়বার পর সেটা ফেটে গিয়েছে!"

মানিক বললে, "এই বদ্ধ ঘরের ভিতরে বোমা ফাটলে আমরা কেউ আর বাঁচতুম না!"

—"তা হয়তো বাঁচতুম না। কিন্তু তা হয়নি ব'লে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।"

সুন্দরবাবু রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু কৃষ্ণ যাদের রক্ষা করলেন না, তাদের অবস্থাটা দেখে আসা দরকার। চলুন, নীচেয় নেমে তদারক ক'রে আসি।"

রাজপথের উপরে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে রক্ত আর রক্ত! এখানে ওখানে বইছে যেন রক্তের রাঙা লহর! তারই মধ্যে ছটফট করছে তিনটে রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন দেহ। আর একটা দেহ একেবারে আড়ষ্ট ও নিস্পন্দ। সে বীভৎস দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায় না—বীরেন শিউরে উঠে উঃ ব'লে হাতে চোখ ঢেকে মাটির উপরে ব'সে পড়ল।

রাজপথের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "দেখ জয়ন্ত, দেখ! বোমা ফেটে পথের উপরে কত বড় একটা গর্ত হয়েছে—ওরে বাস্ রে বাস্!"

মানিক বললে, "অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা!"

জয়ন্ত বললে, "কিন্তু ছুঁড়লে কে, সেইটেই এখন জানা দরকার।"

পথে লোকে লোকারণ্য, ছুটোছুটি, ভীত চীৎকার! কেউ স্থির হ'য়ে কারুর কথা শুনছে না, নানাজনে নানাপ্রকার মত জাহির করছে!

ওধারের ফুটপাতে ছিল একখানা চায়ের দোকান, জয়ন্তের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বললে, "হ্যাঁ স্যর, ব্যাপারটা আমি দেখেছি! একখানা ছুটন্ত মোটর থেকে একটা লোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে আপনার বাড়ির দোতলার জানালার দিকে বলের মত একটা জিনিস ছুঁড়ে মারলে—"

সুন্দরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "কি রকম মোটর? ট্যাক্সি?"

—"না, লাল রঙের প্রাইভেট মোটর।"

—"সিডান বডি?"

—"না, খোলা গাড়ি।"

—"নম্বর?"

—"আরে মশাই, নম্বর দেখবার সময় কি পেয়েছি? তারপরই ভীষণ শব্দ আর বিষম হুলুস্থুল—আঁতকে উঠে সেইদিকেই তাকিয়ে রইলুম।"

—"তুমি তো ভারি বোকা লোক হে! কেন তুমি আঁতকে উঠলে, কেন তুমি নম্বরটা টপ্ ক'রে দেখে নিলে না?"

—"মশাই গো, এখানে থাকলে আপনিও তখন আমারই মতন বোকামি করতেন!"

—"কখখনো নয়, কখখনো নয়, আমি সে পাত্রই নই!"

জয়ন্ত বললে, "যাকগে ও-কথা। তারপর কি হ'ল বল।"

—"তারপর মুখ ফিরিয়ে সেই লাল মোটরখানা আর দেখতে পেলুম না। গাড়িখানা একবারও থামে নি, তীরের মত ছুটে মিলিয়ে গিয়েছে।"

সুন্দরবাবু গজগজ ক'রে বললেন, "যাবেই তো, মিলিয়ে যাবেই তো! তুমি নম্বর দেখবে ব'লে সে তো আর দাঁড়িয়ে থাকবে না!"

চায়ের দোকানের মালিক হঠাৎ সচমকে ব'লে উঠল, "দেখুন, দেখুন!"

—"দেখব? কি দেখব?"

—"সেইরকম একখানা লাল মোটর আবার এইদিকে ছুটে আসছে!"

—"হুম্, বল কি ?"

—"না, না, গাড়িখানা খানিকটা এসেই আবার মোড় ফিরে পাঁই পাঁই ক'রে স'রে পড়ল !"

সুন্দরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "ট্যাক্সি ! ট্যাক্সি !"

মানিক বললে, "মিছে চেঁচিয়ে গলা ভাঙবেন কেন সুন্দরবাবু ? কোথাও ট্যাক্সি নেই, লাল মোটরের পিছু ধরা অসম্ভব !"

বীরেন বললে, "হ্যাঁ, লাল মোটরখানা আড়ালে চ'লে গেছে—আর ওর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।"

সুন্দরবাবু বললেন, "ফাঁকি দিলে যে, ফাঁকি দিলে ! হায় হায় হায় হায় !"

জয়ন্ত বললে, "দূর থেকে কারুকে চিনতে পারলুম না বটে, তবে এটুকু আমার চোখ এড়ায় নি যে, গাড়ির ভিতরে ছিল তিনজন আরোহী আর তাদের একজনের দেহে ছিল সাহেবী পোশাক।"

—"কিন্তু জয়ন্ত, ওখানা বোধহয় অপরাধীদের গাড়ি নয়। তাহ'লে পালিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত না।"

—"গাড়িখানা সন্দেহজনক। নইলে এইদিকে আসতে আসতে হঠাৎ অন্য পথ ধ'রে এত তাড়াতাড়ি স'রে পড়ল কেন ?"

মানিক বললে, "আমার বোধহয় অপরাধীরা দেখতে এসেছিল তাদের বোমা লক্ষ্যভেদ করেছে কি না !"

—"আমারও সেই বিশ্বাস। তারপর ঘটনাস্থলে আমাদের বহাল তবিয়তে বর্তমান দেখে চটপট চম্পট দিয়েছে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কি দুঃসাহসী অপরাধী !"

—"এই মামলার সঙ্গে ফেরারী আসামী প্রতাপ চৌধুরীর কোন সম্পর্ক আছে কি না জানি না, কিন্তু তার দুঃসাহসের প্রমাণ আগেও কি আপনি পান নি সুন্দরবাবু ?"

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, "পেয়েছি বৈকি, পেয়েছি বৈকি ! ঐ দেখ, পুলিস এসে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বিউল্যান্সের গাড়িও !"

জয়ন্ত বললে, "আসুন, আমরা চুপি চুপি স'রে পড়ি।"

—"কিন্তু স'রে পড়বে কোথায় ? বোমা ছুঁড়েছে তোমার বাড়ির উপরে, পুলিস তোমাকে খুঁজবেই।"

—"সে সব পরের কথা। এখন আর একটা দৃশ্য দেখুন।"

—"দৃশ্য ? আবার কি দৃশ্য ?"

—"চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। একটু দূরে তাকিয়ে দেখুন, আমাদের পাড়ার হোটেলবাড়ির ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র মূর্তি ! পরনে গেরুয়া কাপড়, মাথায় জটা, একমুখ দাড়ি-গোঁফ। এই লোকটাই কি খানিক আগে মধুর হাতে বেনামা চিঠি সমর্পণ ক'রে গেছে ?"

—"হুম্ !"

বাড়ির ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে এক বিচিত্র মূর্তি !

—"আচ্ছা, আমি খবরাখবর নিয়ে আসি, আপনারা বাড়ির ভিতরে গিয়ে অপেক্ষা করুন।" এই ব'লে জয়ন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল।

(ক্রমশঃ)

বাধ্য

আর. সিন্হা

মা—মিলি, তুমি প'ড়ছ না ?

মিলি—হ্যাঁ মা, প'ড়ছি ত'।

মা—তবে তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না কেন ?

মিলি—বাঃ রে ! একটু আগে তুমিই ত' পড়ার সময় কথা ব'লতে মানা ক'রলে।

জগৎশেঠের রত্নকুম্ভী
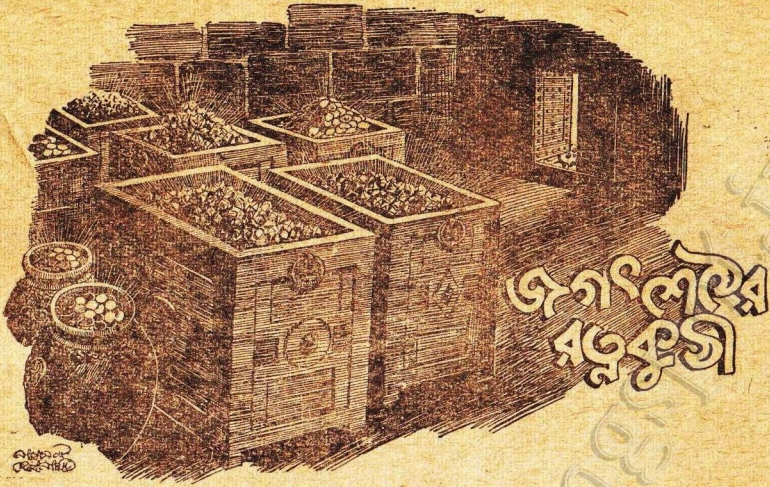
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

উদরপরায়ণ সন্ন্যাসীপ্রবর

(পূর্বানুবৃত্তি)

মানিক ও বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দরবাবু আবার জয়ন্তের বৈঠকখানায় ঢুকে একখানা চেয়ারের উপরে নিজের গুরুভার কলেবর স্থাপন করলেন সশব্দে।

এবং তারপর গলা চড়িয়ে বললেন, "ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! মনটা বড়ই উত্তেজিত হয়েছে বাবা, এক পেয়ালা চা না পেলে তো শান্ত হবে না!"

কিন্তু চায়ের পেয়ালা আসবার আগেই সেখানে হ'ল পুলিসের আবির্ভাব। স্থানীয় থানার ইনস্পেক্টার তদন্তে এসে সুন্দরবাবুকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত ক'রে তুললেন, কিন্তু আসল রহস্যের কোনই পাত্তা পেলেন না, তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল কেউ বা কারা ভ্রমক্রমে এই বাড়ির উপরে বোমা নিক্ষেপ করেছে।

পুলিস প্রস্থান করলে পর মানিক বললে, "সুন্দরবাবু, এইবারে চা আসবে তো?"

—"নিশ্চয়! সেইসঙ্গে কিছু 'ইত্যাদি' থাকলেও আপত্তি করব না।"

—"হ্যাঁ সুন্দরবাবু, আপনার রসনেন্দ্রিয় কি সর্বদাই 'ইত্যাদি'র জন্যে তৈরী হ'য়ে থাকে?"

—"সর্বদাই ভাই, সর্বদাই! জীবদেহের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে উদরপূজা।

অতএব আসুক চায়ের সঙ্গে ইত্যাদি! ও মধু, অ শ্রীমধুসূদন! এত মিষ্টি ক'রে ডাকছি, তবু সাড়া পাই না কেন বাপধন?"

সুন্দরবাবু চা এবং 'ইত্যাদি' নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, ততক্ষণে জয়ন্ত কি করছে দেখে আসা যাক।

জয়ন্ত হোটেলের কাছে আসতে আসতেই দেখতে পেলে, ছাদের উপর থেকে জটাধারী সন্ন্যাসীর মূর্তিটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত ভাবতে লাগল, কেন? তাকেই দেখে নাকি? সে আরো জোরে পা চালিয়ে দিলে।

ভাতের হোটেল। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত খরিদ্দারের ভিড়।
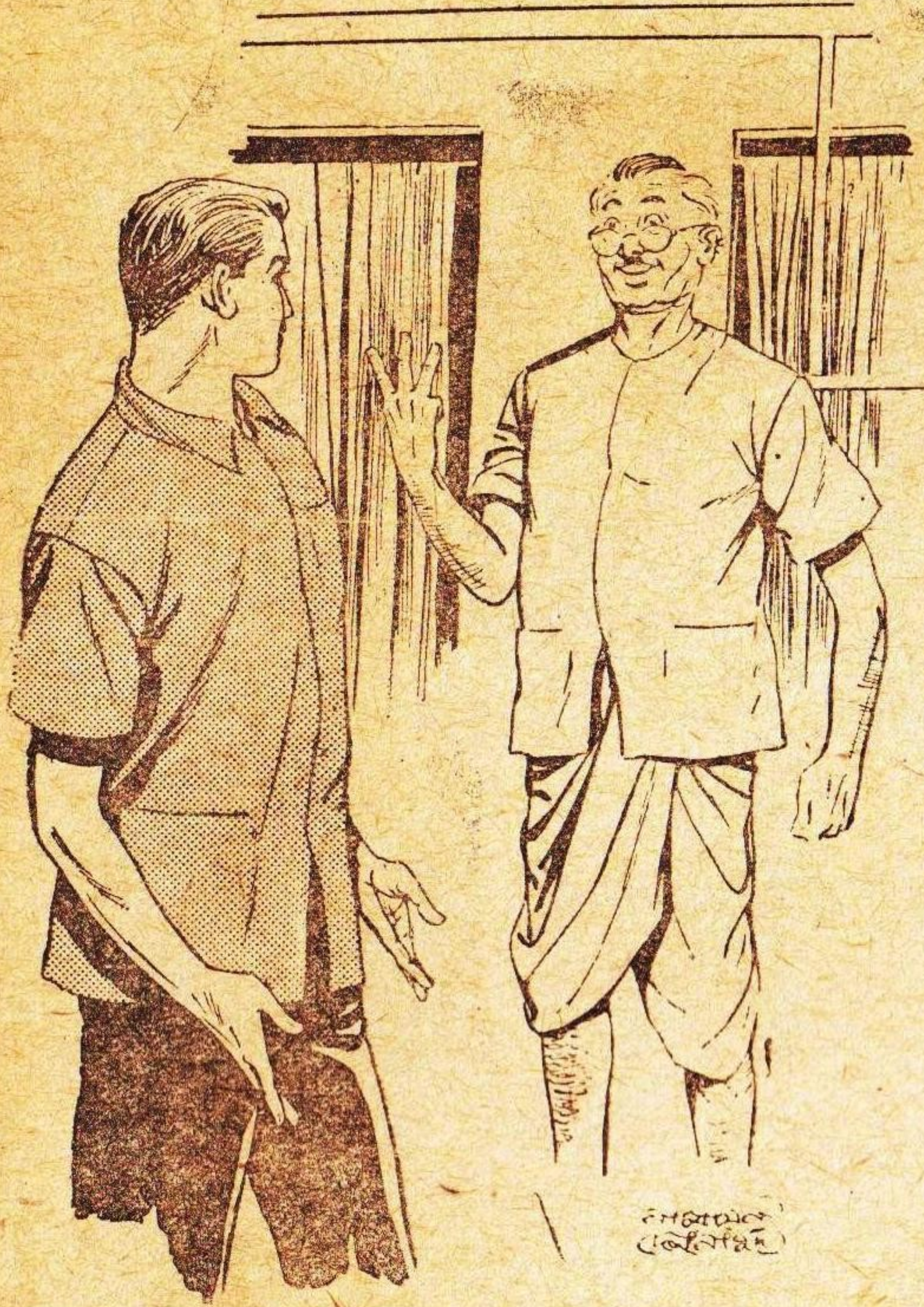
"একাই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনজনের খোরাক।"

মালিক জয়ন্তের পরিচিত। সে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে হোটেলবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, জয়ন্তকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁ মশাই, ওখানে অত দুমদাম, চ্যাঁচামেচি, ছুটোছুটি কেন?"

খুব সংক্ষেপে হোটেলওয়ালার কৌতূহল চরিতার্থ ক'রে জয়ন্ত শুধোলে, "আপনার এখানে আজ কোন স্বামীজী অর্থাৎ সন্ন্যাসীর আগমন হয়েছে?"

—"হয়েছে বৈকি! তাঁর নাম বোধহয় ভোজনানন্দ স্বামী!"

—"আপনার এমন অনুমানের কারণ?"

—"একাই উড়িয়ে দিয়েছেন তিনজনের খোরাক। মাছ-মাংস কিছুই বাদ যায় না। নিরামিষে অত্যন্ত অরুচি। জনকয় এমন স্বামীজীকে পেলে আমাকে আর হোটেল চালাবার জন্যে ভাবতে হয় না।"

—"স্বামীজী কি আপনার পুরানো খরিদ্দার?"

—"উঁহু, আজ এই প্রথম তাঁর পায়ের ধুলো পেলুম।"

—"তিনি এখনো হোটেলে আছেন তো?"

—"আছেন বৈকি!"

—"আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব।"

—"বেশ তো, সোজা উপরে উঠে যান। বিবিধ উপচারে উদরসেবা ক'রে তিনি এখন দেহকে একটু হালকা করবার জন্যে ছাদের উপরে পায়চারি করছেন।"

কিন্তু ছাদের উপরে স্বামীজীর জটা বা টিকির খোঁজ পাওয়া গেল না। হোটেলের কোন ঘরেও নয়। বাড়ির খিড়কির দরজাটা নাকি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন খোলা রয়েছে। স্বামীজীর অন্তর্ধানের রহস্যটা বুঝতে কষ্ট হয় না।

জয়ন্ত আবার সদরের দিকে ফিরে এল হতাশভাবে।

হোটেলওয়ালা তখনও সেখানে মোতায়েন ছিল। "স্বামীজীর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়নি?" মুখ টিপে হাসতে হাসতে সে প্রশ্ন করলে।

—"না। কেমন ক'রে জানলেন আপনি?"

—"আপনি উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজীকে খিড়কির দিক থেকে হনহন ক'রে এদিকে আসতে দেখলুম। আমি তাঁকে আপনার কথা জানালুম। তিনি বললেন, 'আমার এখন বড় তাড়া, কারুর সঙ্গে মুলাকাত করবার ফুরসত নেই।' তারপর হন্তদন্তের মত এগিয়ে ঐ গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন।"

জয়ন্ত বুঝলে, এখন আর স্বামীজীর পশ্চাদ্ধাবন করা মায়ামৃগের পিছনে ছোটার মতই ব্যর্থ হবে। সে বাড়িমুখো হ'ল এই ভাবতে ভাবতে: স্বামীজী আমার সঙ্গে এমন লুকোচুরি খেলছেন কেন? তিনি বেনামা চিঠি বিলি ক'রে গুম হ'য়ে যান। নাগাল ধরতে গেলে পিঠটান দেন। যেন আমাদের ভয় করেন!

স্বামীজীর মাছ-মাংস সবই চলে। একাই খতম করেন তিনজনের খোরাক। যেখানে সেখানে যার তার হাতের রান্না খেতেও তাঁর আপত্তি নেই। স্বামীজী সংযম বা বাছবিচারের ধার ধারেন না। তবে কি তিনি নকল স্বামীজী? তাঁর জটাজূট আর গৈরিক সাজ কি বাজে ভড়ং? তিনি কি ছদ্মবেশী?

বাড়িতে পৌঁছতেই মানিক শুধোলে, "কি হ'ল জয়ন্ত? সন্ন্যাসী কি বললেন?"

—"কিছুই বললেন না। অর্থাৎ কিছু বলবার আগেই আড়ালে গাঢাকা দিলেন।"

—"বটে, বটে? এই সন্ন্যাসীপ্রবর দেখছি রহস্যের অবতার! অতঃপর?"

—"অতঃপর, তল্পিতল্পা বাঁধো। আমরা আজকেই মুর্শিদাবাদ যাত্রা করব।"

সুন্দরবাবু সচমকে বললেন, "হুম্! এর মানেটা কি?"

—"মানে একটা আছে বৈকি! কিঞ্চিৎ তদন্তের দরকার।"

—"কিসের তদন্ত?"

—"গুপ্তধনের।"
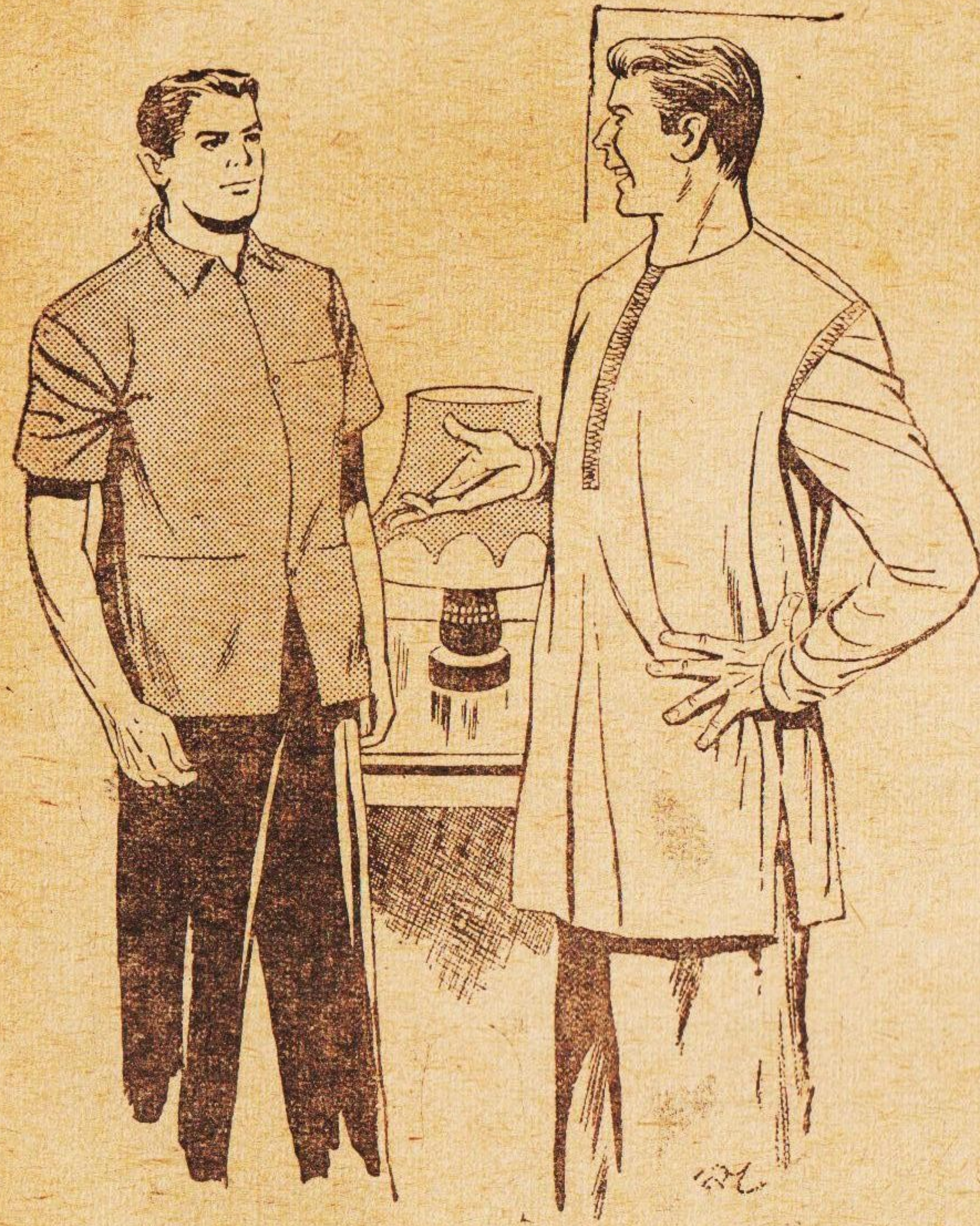
বীরেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললে,...

বীরেন বললে, "আপনি তা'হলে আমার ঠাকুরদার গল্প সত্য ব'লে মনে করেন?"

—"করি! দেখছেন তো, আপনি এখানে এসেছেন ব'লে এর মধ্যেই আমাদের উপরে হামলা শুরু হয়েছে! কোন লোক বা দল চায় না যে, আমরা আপনাকে সাহায্য করি! তাদের এই আপত্তির মূলে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে।"

—"কিন্তু সেজন্যে মুর্শিদাবাদে যাবার প্রয়োজন কি?"

—"জগৎশেঠরা মুর্শিদাবাদেই বাস করতেন।"

—"সুতরাং তাঁদের রত্নকুঠী আছে মুর্শিদাবাদেই, এই হ'ল আপনার যুক্তি?"

—"ঠিক তাই।"

বীরেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বললে, "জগৎশেঠের বিরাট প্রাসাদ মুর্শিদাবাদেই ছিল বটে, কিন্তু এখন গঙ্গা তাকে গ্রাস করেছে। সেখানে আজ গুপ্তধনের সন্ধান করতে গেলে আমাদের ডুবুরী সাজা ছাড়া উপায় নেই। আপনি কি এ খবর রাখেন না?"

—"রাখি বৈকি!"

—"তবে? এইজন্যেই তো আমি ঠাকুরদার কাহিনীটা বাজে গল্প ব'লেই ধ'রে নিয়েছি।"

—"ভুল করেছেন।"

সুন্দরবাবু কিঞ্চিৎ রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, "তোমার যুক্তিটা শুনি?"

—"যথাসময়ে বলব, এখন তল্পিতল্পা বাঁধবার চেষ্টা করুন।"

—"কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন বাপু?"

—"মনে রাখবেন, বীরেনবাবুর ঠাকুরদার লেখা খাতার কিছু অংশ যদুনাথ বসু বা প্রতাপ চৌধুরীর হাতে গিয়ে পড়েছে। তার মধ্যেই হয়তো রত্নকুঠীর ঠিকানা আছে। দেরি করলে আমাদের ভাগ্যে লাভ হবে অষ্টরম্ভা।"

(ক্রমশঃ)

আসর

শ্রীবাস ভট্টাচার্য

বাইরে এখন বাদল বাতাস বড্ডরকম বিচ্ছিরি;
আমরা ক'জন দাওয়ার 'পরে দিচ্ছি বসে টিটকিরি।
বদ্যিখুড়ো হুকোখানি টানছে বসে একমনে,
ব্যাঙগুলো সব পাল্লা দিয়ে ডাকছে কষে প্রাণপণে।
আয় না ভোলা, বস না হেথা, গল্প-শোনার চচ্চরি
লাগবে ভাল; খোশ মেজাজে কাটবে সারা বৎসরই।
এই তো ভাল, বল না কিছু, গোমড়া কেন মুখটা রে?
ঝিঁঝির ছানা ঝিনঝিনিয়ে গান ধরেছে একতারে।
ওই কোনাতে ঢুলছে ভজা ঘুমের ঘোরে আজ খুবই,
আমরা ক'জন দাওয়ায় বসে গল্প ফাঁদি আজগুবী।

জগৎশেঠের রত্নকুম্ভ
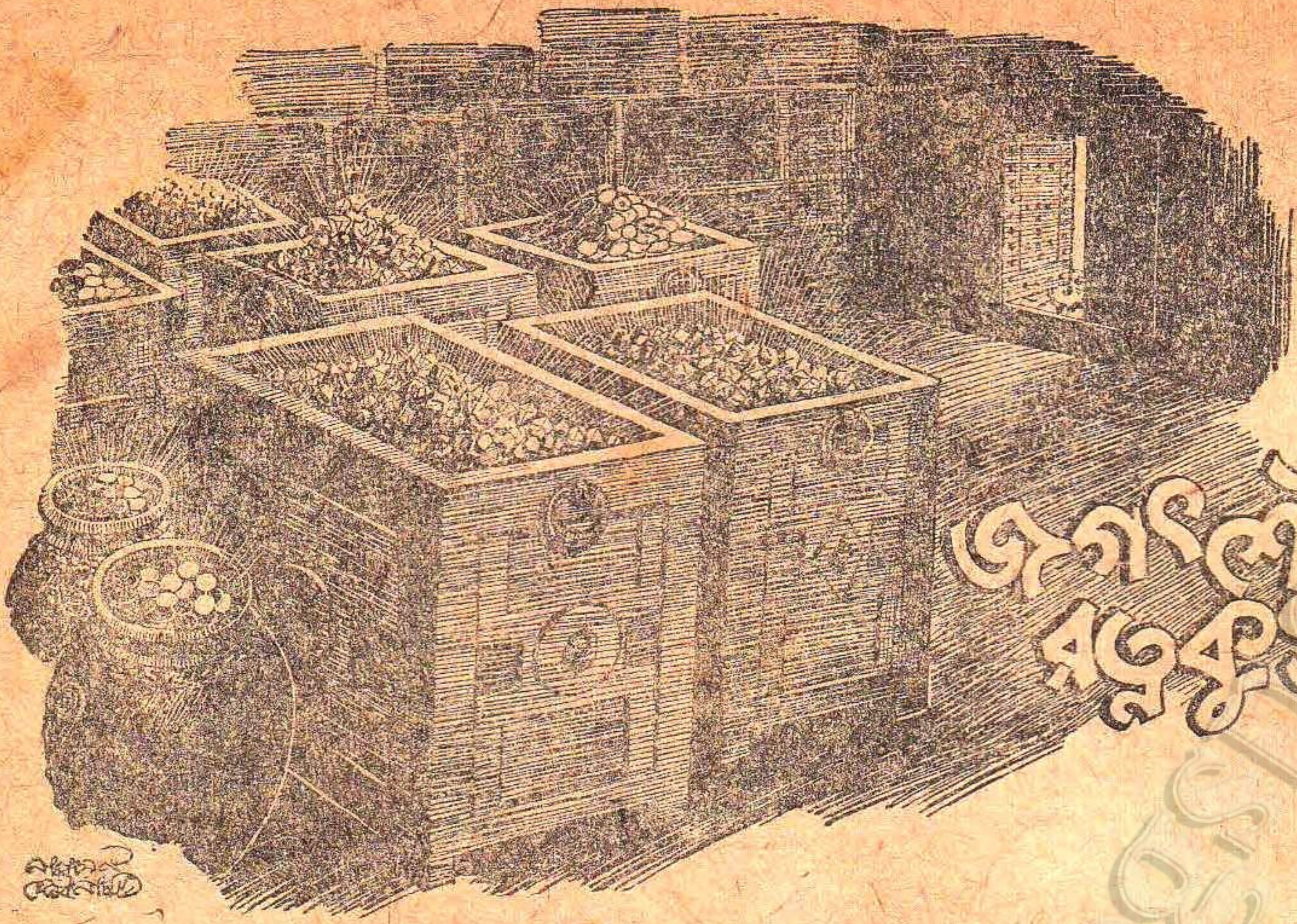
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

সপ্তম অধ্যায়

বিপদের সংকেত

(পূর্বানুবৃত্তি)

মুর্শিদাবাদ। নগরপ্রান্তে শীতকালের মরা গঙ্গা। যেন কোন অগভীর বড় খাল, কারণ জলে স্রোত নেই বললেও চলে। এখানে ওখানে হেঁটে পার হওয়া যায়।

নৌকোর চালে ব'সে জয়ন্ত বলছিল, "পলাশীর যুদ্ধের আগে মুর্শিদাবাদের রূপ ছিল ভিন্নরকম। তখনকার ইংরেজদের চিঠিপত্র প'ড়ে জানতে পারি, সে মুর্শিদাবাদ আকারে আর সৌন্দর্যে বিলাতের লণ্ডন শহরের চেয়ে বৃহৎ আর উন্নত ছিল!"

মানিক বললে, "আজকের মুর্শিদাবাদকে দেখে তো মনে হ'চ্ছে, কলকাতার শহরতলিও এর উপরে টেক্কা মারতে পারে।"

—"এ হ'চ্ছে আজ স্মৃতির শ্মশান। দিকে দিকে ছড়ানো আছে ভাঙাচোরা ইঁটের স্তূপ আর পড়ো-পড়ো, বেরঙা, শ্রীহীন অট্টালিকা।"

বীরেন বললে, "মরা গঙ্গার ভাঙা ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঐ নামমাত্রসার আধুনিক নবাবদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দলে দলে লোক তাই দেখবার জন্যে ওখানে গিয়ে ভিড় করে।"

জয়ন্ত বললে, "আমার কিন্তু ওদিকে ফিরে তাকাতেও লজ্জা করে! যারা একদিন গড়েছিল কবির স্বপ্ন তাজমহল আর আগ্রা-দিল্লীর অপরূপ দুর্গপ্রাসাদ, তাদেরই রুচিহীন, ভাগ্যতাড়িত বংশধররা আজ গ'ড়ে তুলেছে ইংরেজদের অনুকরণে মস্তবড় এক বিজাতীয় প্রাসাদ—নকলের মহিমায় খাস্তা হ'য়ে গিয়েছে আসলেরও স্বরূপ! এ হ'চ্ছে দাস-মনোভাবের অসহনীয় পরিচয়!"

বীরেন বললে, "গঙ্গার এপারে মুর্শিদাবাদে জীবন্ত নবাবদের শৌখিন আস্তানা, আর ওপারে আছে তাঁদের মৃতদেহের অন্তিম ধরণীশয্যা। একদিন নবাবীর জাঁকে যাঁদের জরির জুতো-পরা পা মাটিকে ছুঁতে চাইত না, আজ তাঁদের দেহাবশেষ জীর্ণ কবরের তলায় মাটির সঙ্গে মাটি হ'য়ে মিশে আছে। আলিবর্দীর সমৃদ্ধ সমাধির ছায়ায় দীনতাপূর্ণ কবরের ভিতরে শায়িত আছে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বিপথচালিত সিরাজদ্দৌলার নশ্বর দেহের অশ্রুকরুণ স্মৃতি!"

স্রোতোহীন গঙ্গাজলের উপর দিয়ে দাঁড়ি-মাঝীরা দাঁড় টেনে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নৌকো। অগভীর পরিষ্কার গঙ্গাজল, স্পষ্ট দেখা যায় তলা পর্যন্ত—সর্বত্র বিকীর্ণ রয়েছে স্পঞ্জের মত শৈবালপুঞ্জ।

বীরেন বললে, "ওপারে ঐখানে ছিল সিরাজদ্দৌলার প্রমোদপ্রাসাদ! একদিন ওখানে দুলত কক্ষে কক্ষে রঙিন আলোকমালা, নাচ আর গান আর বাজনায় সংগীতময় হয়ে উঠত চাঁদের আলো। কিন্তু আজ সেখানে দিনের বেলাতেও শোনা যায় না মানুষের কণ্ঠরব, কেবল সন্ধ্যান্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটানা বেজে চলে ঝিল্লীদের বিজনতার গান আর থেকে থেকে কেঁদে ওঠে শিবাদের অশিব নাদ!"

সুন্দরবাবু শুধোলেন, "আর সেই প্রমোদভবন?"

—"সিরাজদ্দৌলার অপঘাত-মৃত্যুর পর তাঁর প্রমোদভবনও গঙ্গাগর্ভে আত্মবিসর্জন দিয়েছে।"

সবাই স্তব্ধ। নৌকো এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে। জলে ঝপ ঝপ ক'রে দাঁড় ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

মানিক জিজ্ঞাসা করে, "গঙ্গাতীরের কাছে জলের কাছে জেগে রয়েছে কতকগুলো বড় বড় ইঁটের স্তূপ। দেখলে মনে হয়, যেন একসময়ে ওখানে ছিল কোন অট্টালিকা।"

বীরেন বললে, "তাই বটে। যাঁর কাছে হাত পেতে নবাবের রাজত্ব আর ইংরেজদের ব্যবসায় চলত, একদিন ঐখানেই ছিল ভারতের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের জগৎশেঠের ঐশ্বর্যগর্বিত বৃহৎ প্রাসাদ! আজও তার দু-এক টুকরো ভগ্নাবশেষ দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাও তলিয়ে যাবে কীর্তিনাশা গঙ্গার গর্ভে!"

জয়ন্ত কঠিন কণ্ঠে বললে, "যাবেই তো। যাওয়াই উচিত। শেঠদের স্মৃতিও আমার মনকে পীড়িত করে। রাজপুতানার শুকনো মরুপ্রান্ত থেকে বিদেশী মাড়োয়ারী এসেছিল সুজল সুফল বাংলাদেশের অর্থ লুণ্ঠন করতে। তারা লক্ষ্মীলাভ করেছিল বটে, কিন্তু বাংলার প্রতি ছিল না তাদের এতটুকু প্রাণের টান, তাই তারা বংশানুক্রমে প্রথমে রাজার, তারপর দেশের বিরুদ্ধে বার বার চক্রান্ত করতে কুণ্ঠিত হয় নি। অবশেষে আরো কোন কোন দুরাত্মার সঙ্গে মিলে জগৎশেঠরাই ষড়্‌যন্ত্র ক'রে বাংলাদেশকে লুটিয়ে দেয় ফিরিঙ্গীরাজের বুটজুতোর তলায়। সেই মহাপাপের ফলেই তো এই দেশদ্রোহী বংশের উপরে পড়েছে বিশ্বদেবের অমোঘ অভিশাপ, ইতিহাসে আছে কেবল তাদের চরম অপযশ, নিয়তি কেড়ে নিয়েছে তাদের সমস্ত সৌভাগ্য আর তাদের ঐশ্বর্যের শেষ স্মৃতিটুকুও লাভ করেছে সলিল-সমাধি। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা করেন নি। সুদূর মুঙ্গেরে তাদের দুই ভাইয়ের জীবন্ত দেহ গ্রাস ক'রেও তাঁর ক্ষুধা মেটে নি, মুর্শিদাবাদে এসে বিশ্বাসঘাতকদের অস্থাবর সম্পত্তি পর্যন্ত নিজের জঠরের জলাবর্তে টেনে না নিয়ে তিনি ছাড়েন নি!"

জলের উপরে জেগে-থাকা প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের একপাশে চুপ ক'রে ব'সে আছে ছবিতে আঁকার মত একটা নিশ্চল বক—যেন বিভোর হ'য়ে আছে অতীত গৌরবের স্বপ্নে।

বীরেন বললে, "জয়ন্তবাবু, আজ ঐ জলের তলায় কোথায় খুঁজে পাবেন জগৎশেঠের রত্নকুঠী?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "আমরা তো জলের তলায় খুঁজব না!"

—"তবে কোথায়? ডাঙায়?"

—"হ্যাঁ।"

—"ডাঙায় শেঠদের প্রাসাদের কোন চিহ্নই নেই।"

—"তবু খুঁজে দেখব।"

—"কি আশ্চর্য, আপনার বক্তব্য কি ?"

সুন্দরবাবুও বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "সত্যি জয়ন্ত, তুমি যুক্তিহীন কথা বলছ !"

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "সুন্দরবাবু, খাতায় জগৎশেঠদের ইতিহাসে কি লেখা আছে ? জগৎশেঠ-কুশলচাঁদ নিজের সম্পত্তির কতক অংশ লুকিয়ে রাখবার জন্যে গুপ্তকুঠী নির্মাণ করেছিলেন। এখন ভেবে দেখুন, কুশলচাঁদ নিশ্চয় নির্বোধ ছিলেন না। নিজেদের জনাকীর্ণ, বিখ্যাত প্রাসাদের ভিতরে গুপ্তকুঠী নির্মাণের চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে, এটা তিনি ভালো ক'রেই জানতেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল প্রাসাদ থেকে দূরে অন্য কোথাও গুপ্তকুঠী নির্মাণ করা। রাজধানীর বাইরেও যে ধনকুবের জগৎশেঠদের ভূসম্পত্তি ছিল, এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। বীরেনবাবুর ঠাকুরদা চন্দ্রনাথবাবু গঙ্গাতীরের এক পোড়ো বাগানবাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। তার পিছনে আছে এক সেকেলে নির্জল ইঁদারা—তার গায়ে গাঁথা লোহার দরজা। আমি আন্দাজ করি, ঐ বাগানবাড়ির অধিকারী ছিলেন জগৎশেঠ-কুশলচাঁদ। সেকালের রাজা-রাজড়া আর ধনপতিরা প্রায়ই পুষ্করিণী বা ইঁদারার মধ্যে গুপ্তধন রক্ষা করতেন, 'সোনার আনারস' মামলাতেও আমরা এই শ্রেণীর এক ইঁদারার সন্ধান পেয়েছিলুম, আশা করি আপনাদের তা মনে আছে। কুশলচাঁদও নিশ্চয় সেকালের সেই
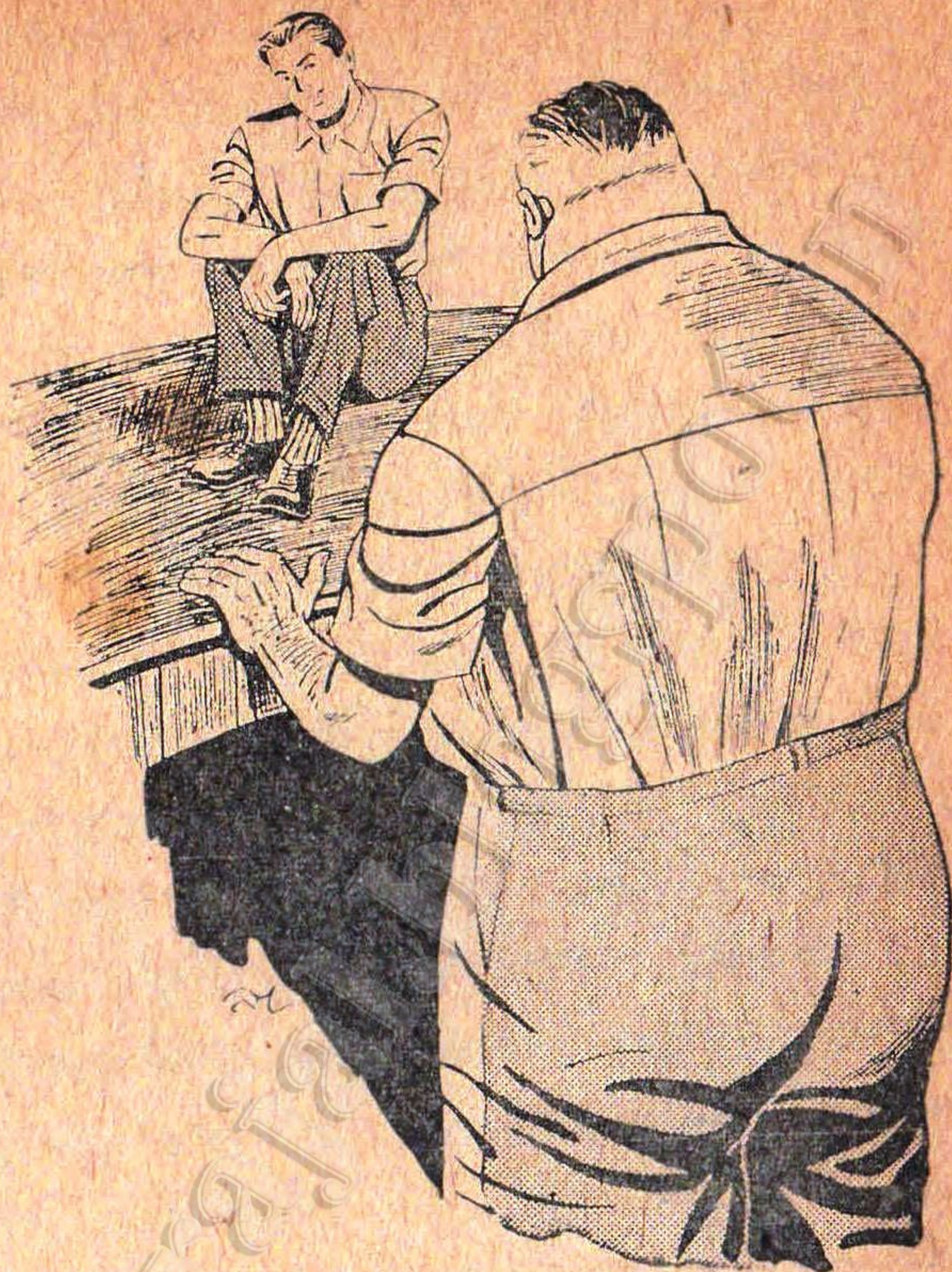
"সত্যি জয়ন্ত, তুমি যুক্তিহীন কথা বলছ !"

রাতি বজায় রেখেছিলেন। ইঁদারার গুপ্তকুঠীর মধ্যে রক্ষা করেছিলেন নিজের অতুল সম্পত্তির কতক অংশ। গুপ্তধন রক্ষা করবার পর সেকালের ধনিকরা আর এক নিষ্ঠুর প্রথা মেনে চলতেন। যাদের সাহায্যে তাঁরা ধনরত্ন পুঁতে রাখতেন, গুপ্তধনের নিরাপত্তার জন্যে তাদের হত্যা করা হ'ত। কুশলচাঁদও তাই করেছিলেন, আর চন্দ্রনাথবাবু ইঁদারায় নেমে দেখেছিলেন সেই নিহত হতভাগ্যদের মাংসহীন কঙ্কাল। ইঁদারানির্মাতা আর ধনবাহকদের হত্যা করবার পর কুশলচাঁদ ইঁদারা জলে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর কালক্রমে কুশলচাঁদের মৃত্যু, জগৎশেঠদের পতন, তাঁদের প্রাসাদের পাতালপ্রবেশ, বেওয়ারিস বাগানবাড়ির শোচনীয় দুর্দশা—ঘরদোর যায় ভেঙেচুরে, বাগান পরিণত হয় কাঁটাজঙ্গলে আর ইঁদারা হয়ে পড়ে জলশূন্য। মানুষ আর সে অঞ্চল মাড়ায় না। অনেককাল পরে চন্দ্রনাথবাবু ফুটবল কুড়োতে ইঁদারায় নেমে অস্থানে লোহার দরজা দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তিনি জগৎশেঠদের গুপ্তধনের কাহিনী জানতেন। তাঁর সন্দেহ জাগ্রত হয়। তারপর আবার গোপনে ইঁদারায় ফিরে গিয়ে গুপ্তধনের সন্ধান পান আর তা হস্তগত করেন। বোধহয় সেই সম্পত্তিরই খানিক অংশ নিয়ে তাঁর ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন। অবশিষ্ট সম্পত্তি অসময়ের ভয়ে আবার লুকিয়ে রাখেন। আমরা তারই আশায় এখানে এসেছি। তাঁর লেখা খাতার সবটা পেলে হয়তো আমাদের কাজের যথেষ্ট সুরাহা হ'ত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা বিপক্ষ দলের হস্তগত হয়েছে। তবু আমরা একবার বাগানখানা খুঁজে দেখবার চেষ্টা করব।"

সুন্দরবাবু কৌতুকহাস্য ক'রে বললেন, "ভায়া হে, তুমি যে দেখছি বেশ একটি মনগড়া গল্প ফেঁদে বসেছ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সেই অজানা বাগানবাড়ির ঠিকানা কোথায় পাবে?"

—"চন্দ্রনাথবাবু লিখেছেন, জিয়াগঞ্জের দশ-বারো মাইল তফাতে আছে সেই বাগানবাড়ি।"

—"হুম, তাহ'লেই কেল্লা ফতে হয়ে গেল নাকি?"

—"আরে মশাই, একটু মাথা খাটাবার চেষ্টা করুন। ভুলবেন না, জায়গাটা আছে গঙ্গার ধারে। মুর্শিদাবাদের পরেই জিয়াগঞ্জ। সেখান থেকে আমরা হাঁটা-পথে গঙ্গাতীর ধ'রে দশ-বারো মাইল অগ্রসর হব। তারপর খুঁজে সহজেই আবিষ্কার

...রতে পারব এমন একখানা ...ওয়ারিস, ভাঙাচোরা, পোড়ো, ...কেলে বাগানবাড়ি—যার ...ছনে আছে জলশূন্য ইঁদারা আর ...র পরে একটা মাঠ। গঙ্গাতীরে ...-বারো মাইলের ভিতরে ঠিক ...ইরকম পরিস্থিতির মাঝখানে ...রিত্যক্ত প্রাচীন বাগানবাড়ি ...বোধকরি আর নেই।"

মানিক বললে, "আমি তোমার মত সমর্থন করি।"

সুন্দরবাবু দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ...বললেন, "জয়ন্ত যে ভাবে কায়দা ক'রে ব্যাপারটাকে সাজিয়ে দাঁড় করিয়েছে, তাতে আমাদেরও ...দায় দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কি বলেন বীরেনবাবু?"

একখানা বাড়ির আড়ালে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে রইল। [পৃষ্ঠা ৫১২

বীরেন বললে, "আমি আর কি বলব মশাই, এ সব গোলমেলে ব্যাপারে আমার মাথা খোলে না। তবে আমার মন্ত্র হ'চ্ছে—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'!"

সুন্দরবাবু বললেন, "সাধু, সাধু! একালের ছোকরারা সবাই যদি ঐ মন্ত্র মানত! তাহ'লে জয়ন্ত, কোথায় নেমে আমরা হাঁটাপথ ধরব?"

—"জিয়াগঞ্জের ঘাটে।"

মানিক খুঁতখুঁতে গলায় বললে, "কিন্তু জয়ন্ত, অনেকক্ষণ থেকে আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি।"

—"কি ব্যাপার?"

—"একখানা উটকো পানসি আমাদের পিছনে পিছনে আসছে।"

—"হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। তার অন্য সব জানালা বন্ধ, কেবল একটা খোলা জানালায় একজন লোক যেন আমাদেরই পানে তাকিয়ে আছে।"

—"পানসিখানা একবারও আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় নি। আম যখন জগৎশেঠের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের কাছে নৌকো থামিয়েছিলুম, পানসিখানাও থেমে পড়েছিল। তারপর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবার ওর যাত্রা শুরু

মাঝী হাঁকলে, "বাবুজী, এই তো জিয়াগঞ্জের ঘাট!"

জয়ন্ত বললে, "এস আমরা এইবারে নেমে প'ড়ে ঐ পানসিখানার ওপ নজর রাখি।"

নৌকো ঘাটে লাগল। সবাই একে একে নেমে প'ড়ে একখানা বাড়ি আড়ালে গিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে দাঁড়িয়ে রইল।

অজানা পানসিখানা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। আধ মিনিট থেমে দাঁড়াল, তারপ আবার ঘাট ছাড়িয়ে তরতর ক'রে সোজা চ'লে গেল যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকে।

সুন্দরবাবু বললেন, "বাব্বা, বাঁচলুম! ফাঁড়া কেটে গেল! ভেবেছিলুম, ষণ্ডামা বেটারা আবার বোমা কি বন্দুক ছুঁড়বে, মনে মনে আমি জলযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলুম!"

তাঁর গা টিপে দিয়ে মানিক বললে, "এখনি অপ্রস্তুত হবেন না মশাই!"

—"হুম্, মিছে ভয় দেখাও কেন?"

—"আবার ঐ দেখুন!"

—"কি আবার দেখব?"

—"আবার একখানা নৌকো আসছে!"

—"এলেই বা! নদী দিয়ে নৌকো যাবে না?"

—"নৌকোর জানালার কাছে কে ব'সে আছে দেখছেন তো?"

সুন্দরবাবু দেখলেন, চমকে উঠলেন, তাঁর দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত!

নৌকোর জানালার কাছে যে ব'সে আছে তার মাথায় জটার ঘটা, মুখে গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল, গায়ের গেরুয়া কাপড়েরও খানিকটা দেখা যাচ্ছে!

জয়ন্ত বললে, "সেই সন্ন্যাসী!"

এ নৌকোখানাও জিয়াগঞ্জের ঘাট ছাড়িয়ে অগ্রসর হ'ল।

সুন্দরবাবু বললেন, "কী যেন হ'চ্ছে, কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!"

জয়ন্ত বললে, "এখন আর কিছুই বোঝবার দরকার নেই—এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন!"

(ক্রমশঃ)

———

শুকতারা—
সপ্তদশ বর্ষ,
অষ্টম সংখ্যা,
আশ্বিন ১৩৭১
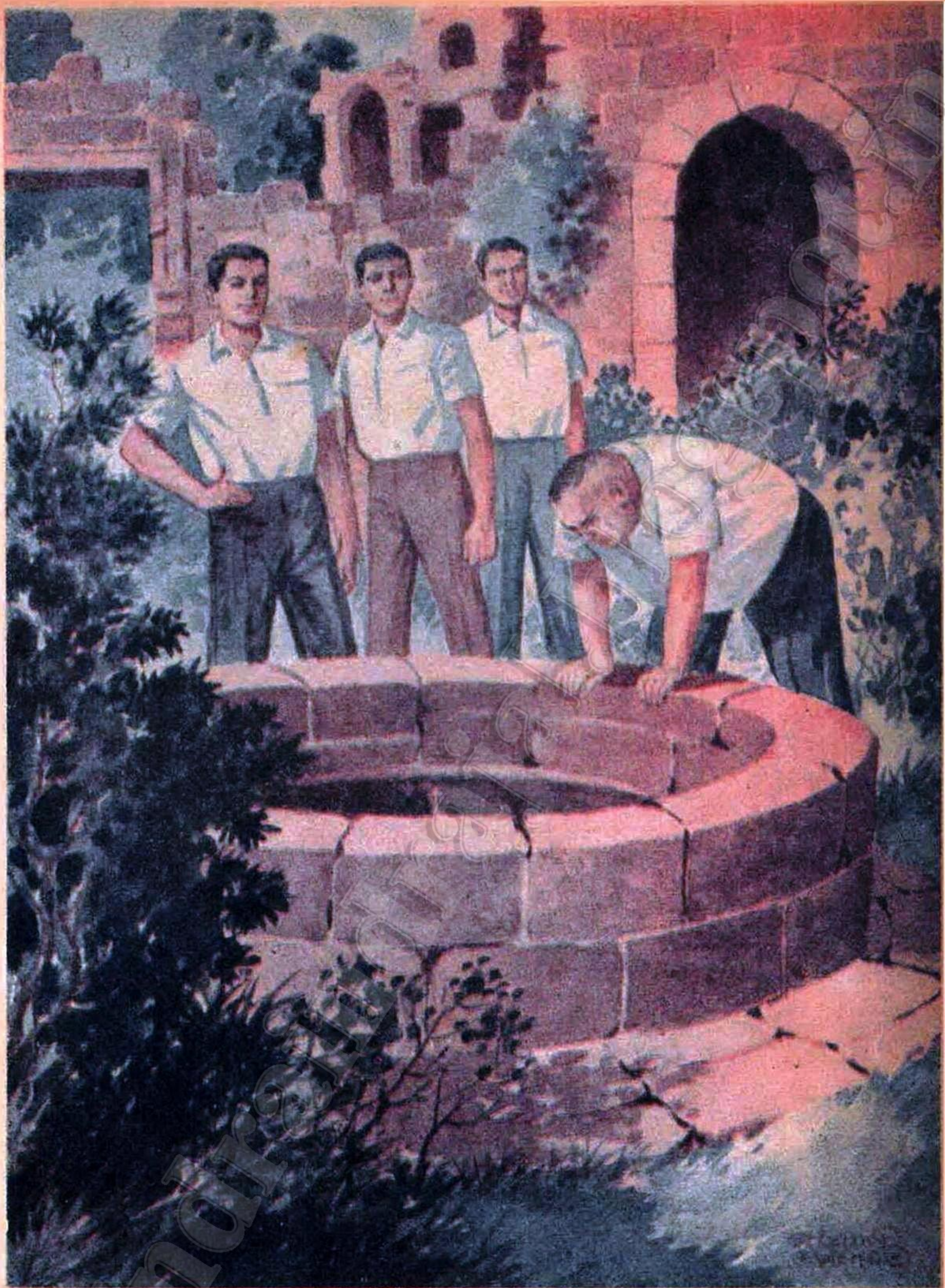
ওরে বাবা, এর্ তলাটা যে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে

জগৎশেঠের রত্নকুঠী—ভিতরে দেখুন

জগৎশেঠের রত্নকুম্ভী
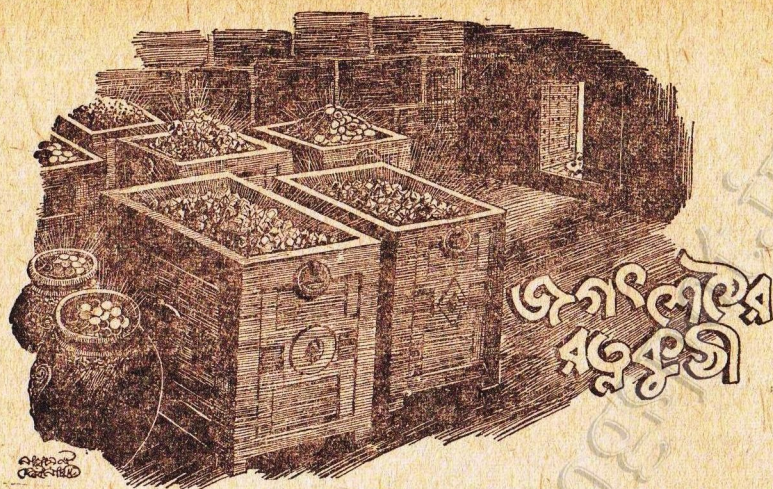
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

অষ্টম অধ্যায় [অপ্রকাশিত উপন্যাস]

ষড়্‌যন্ত্রের গন্ধ

(পূর্বানুবৃত্তি)

গঙ্গার ধারে সে জায়গাটাকে বাগানও বলা যায় না, বাড়ি বলাও চলে না। তার স্থানে স্থানে সীমানার বেষ্টনীর কিছু কিছু চিহ্ন এখনো চোখে পড়ে, এই-মাত্র। বাগানের বদলে আছে গোটাকয়েক পুরাতন অফলা ফলগাছের সঙ্গে অশথ-বটের দঙ্গল ও যত্রতত্র বিকীর্ণ ঝোপঝাপ আগাছার জঙ্গল। এবং বাড়ির বদলে আছে ভেঙে-পড়া ছাদ আর ধ্ব'সে-যাওয়া বনিয়াদ আর কোনক্রমে দাঁড়িয়ে-থাকা এক-একটা টুটা-ফাটা দেওয়াল। দরজা-জানালা একেবারেই অদৃশ্য। তবে একসময়ে এখানে যে কোন শৌখিন ধনিকের সাধের ডেরা ছিল, তার সামান্য প্রমাণ এখনো বর্তমান আছে এক-একটা ভাঙা দেওয়ালের গায়ে বিমলিন পঙ্কের কারুকার্যে। লোকের মুখে শোনা যায়, আগে এখানে ছিল বাগানবাড়ি এবং তার পিছনকার মস্তবড় মাঠটা আজও বাগানবাড়ির মাঠ নামে পরিচিত। সেই সূত্রেই জায়গাটার খোঁজ পাওয়া সহজে সম্ভবপর হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, "এই হ'চ্ছে সেই ইঁদারাটা। বাঙালীরা যে কুয়া বা পাতকুয়া তৈরি করে তা হ'চ্ছে ইঁদারারই ছোট আকার। সাধারণতঃ ইঁদারা তৈরি করে

অবাঙালীরা আর মনে রাখতে হবে জগৎশেঠদের পূর্বপুরুষ এসেছিলেন রাজপুতানা থেকে।"

সুন্দরবাবু ইঁদারার ভিতরে উঁকিঝুঁকি মেরে বললেন, "ওরে বাবা, এর তলাটা যে অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না! তলায় কি আছে কে জানে!"

জয়ন্ত বললে, "সঙ্গে দড়ির সিঁড়ি এনেছি, তলায় কি আছে এখনি দেখতে পাব।"

সুন্দরবাবু হতাশভাবে বললেন, "না ভেবেচিন্তে যখন ডানপিটেদের সঙ্গে এসেছি, তখন পাতাল কত দূর না দেখেই বা উপায় কি? কিন্তু বাপু, আমার অসামান্য বপুখানি নিয়ে ঐ যৎসামান্য দড়ির সিঁড়ি ধ'রে দোদুল্যমান হ'লে আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা, সেটা খেয়ালে আছে কি?"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে দড়ির সিঁড়ি নিয়ে নিযুক্ত হ'য়ে রইল।

সুন্দরবাবু সেদিক থেকে কোন সান্ত্বনা না পেয়ে বললেন, "তার উপরে জানোই তো, আমার আবার একটুখানি—ওর নাম কি—ইয়ে আছে!"

মানিক সুন্দরবাবুকে জানত, মুখ টিপে হাসতে লাগল।

বীরেন কিছুই বুঝতে না পেরে শুধোলে, "ইয়ে আছে? সে আবার কি?"

—"ঐ যে গো, যাকে তোমরা বল ভূতপ্রেত!"

—"ভূতপ্রেত?"

—"হ্যাঁ। আমি যে ওঁদের অস্তিত্ব মানি!" ব'লেই সুন্দরবাবু যুক্তকরে ললাটদেশ স্পর্শ করলেন।

—"ভূতপ্রেতের সঙ্গে আজকের ব্যাপারের সম্পর্ক কি?"

—"সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন না? পাজী কুশলচাঁদটা নাকি অনেকগুলো লোককে খুন করেছিল আর তাদের কঙ্কালগুলো নাকি ইঁদারার ভেতরেই প'ড়ে আছে। হুম্! তাদের প্রেতাত্মারাও যে ঐখানে আস্তানা পাতে নি, এমন কথা কি জোর ক'রে বলা যায়? অভিশপ্ত শেঠদের গুপ্তধনও আজ হয়েছে যকের ধন, প্রাণটি হাতে ক'রে ঐ ইঁদারার ভেতরে নামতে হবে।"

মানিক বললে, "বেশ তো, প্রাণটি হাতে ক'রেই ইঁদারায় নামবেন, ভূত-প্রেতরা দাবি করলেও তাদের হাতে প্রাণ সমর্পণ করবেন না!"

সুন্দরবাবু মুখ গোমড়া ক'রে বললেন, "মরছি নিজের জ্বালায়, তুমি আবার মস্করা ক'রে জ্বালার উপরে জ্বালা দিও না মানিক! আমি সার কথাই বলছি। চন্দ্রনাথবাবু কি ইঁদারায় নেমে অপার্থিব কণ্ঠের ফোঁস্-ফোঁসানি শোনেন নি?"

জয়ন্ত বললে, "তার মধ্যে অপার্থিব কোন কিছু নেই।"

—"নেই? তবে ফোঁস্-ফোঁসানিটা কিসের শুনি?"

—"নিশ্চয় সাপ-টাপ। এঁদো কুয়োয় সাপ বাসা বাঁধে।"

—"এটা তোমার অনুমানমাত্র।"

জয়ন্ত দড়ির সিঁড়ির উপরে পা রেখে অধীর স্বরে বললে, "বাজে কথায় সময় ব'য়ে যায়! বেলা বেড়ে চলেছে, আর দেরি নয়! মানিক, পাতালে আছে রাতের অন্ধকার, একটা লণ্ঠন আমাকে দাও, আর একটা লণ্ঠন তোমার পিঠে ঝুলিয়ে নাও।"

জয়ন্ত বললে, "এই হ'চ্ছে সেই ইঁদারাটা। [পৃষ্ঠা ৫৬১

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণ স্বরে বললেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, বিপদসাগরে গোঁয়ারের মত চোখ বুঁজে ঝাঁপ দিও না! আমার কেমন সন্দেহ হ'চ্ছে, কারা যেন আড়ালে আবডালে গা ঢাকা দিয়ে আছে!"

—"শত্রুরা কেমন ক'রে জানবে, আমরা বাগানবাড়ির ঠিকানা আবিষ্কার করেছি?"

—"কিন্তু বুদ্ধিমানের মতে, শত্রুদের অবহেলা করা উচিত নয়।"

জয়ন্ত ইঁদারার মুখ থেকে স'রে এসে বললে, "মানিক, সুন্দরবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, ওঁর পাকা চুলের সম্মান রক্ষা না করলে অন্যায় হবে। আবিষ্কারের উত্তেজনায় আত্মহারা হ'য়ে আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছিলুম।"

মানিক বললে, "না, ভুলি নি। এ ব্যাপারে আসল কথাই হ'চ্ছে গুপ্তধনের কথা।"

—"ঠিক তাই কি? আমার মতে, এখনো 'দিল্লী বহুদূর'! যাত্রাপথে বিস্তর বাধা! গুপ্তধন আমাদের চরম লক্ষ্য বটে, কিন্তু যাতে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছতে না পারি, সেই উদ্দেশ্যে একদল শত্রু কি আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে না?"

—"কিন্তু সেই শত্রুরা এখন কোথায়?"

—"জলপথে তারা যে আমাদের অনুসরণ করেছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।"

—"কিন্তু হঠাৎ স্থলপথ অবলম্বন ক'রে আমরা তাদের ফাঁকি দিতে পেরেছি।"

—"পেরেছি কি? এইটেই হ'চ্ছে প্রশ্ন।"

—"হাঁটাপথে এতখানি এগিয়ে এলুম, কোন শত্রুর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাই নি।"

—"তা পাই নি। কিন্তু 'সোনার আনারস' মামলায় আমরা যখন বাঘরাজাদের গুপ্তধনের সন্ধানে যাত্রা করেছিলুম, তখন সারা পথের কোথাও কি প্রতাপ চৌধুরীর অস্তিত্ব টের পাওয়া গিয়েছিল? আগেই তোমাদের কাছে আমি প্রতাপ চৌধুরীর পরিচিত যুদ্ধকৌশলের কথা উল্লেখ করেছি। এ যদি সেই প্রতাপ চৌধুরী হয়, তবে এবারেও সে নিজের নির্বাচিত স্থান ছাড়া যেখানে সেখানে আত্মপ্রকাশ করবে কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমি কিন্তু পথ চলতে চলতে হাওয়ায় হাওয়ায় পেয়েছিলুম কেমন যেন ষড়্‌যন্ত্রের গন্ধ!"

মানিক হেসে বললে, "পুলিসের চাকরি ছাড়বার পর দেখছি সুন্দরবাবুর ঘ্রাণ-শক্তি প্রখরতর হ'য়ে উঠেছে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম, ঠাট্টা করতে চাও, ঠাট্টা কর! কিন্তু সংস্কৃত বচনে কি আছে জানো তো? 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে'! অর্থাৎ বিপদের সময়ে বুড়োদের কথা গ্রাহ্য করা উচিত।"

মানিক বিস্ময়ের ভান ক'রে বললে, "ও হরি, কালে কালে হ'ল কি? হ্যাঁ জয়ন্ত, তুমি কি আর কখনো সুন্দরবাবুকে সংস্কৃত বুলি ঝাড়তে শুনেছ?"

—"তা শুনি নি বটে, তবে আপাততঃ ওঁর পরামর্শে আমাদের কান পাতা উচিত।"

—"তুমি কি বলতে চাও?"

—"শত্রুরা সজাগ।"

—"সজাগ, কিন্তু তারা অবস্থান করছে কোথায়?"

—"ধ'রে নাও, আশেপাশে। সামনে নয়, অন্তরালে। তারা আছে যে কোন সুযোগের অপেক্ষায়।"

—"আমরাও কি ঘুমিয়ে আছি?"

—"তা নেই, কিন্তু এখনো আমরা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি। আমাদের সামনেই এমন সব কাণ্ড হ'চ্ছে, যার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।"

—"যথা?"

—"ধরো আজকের ঘটনাই। গঙ্গায় আমাদের পিছু নিয়েছিল যেন শত্রুদেরই পানসি। কিন্তু তার পিছনে পিছনে নৌকোয় চেপে যে সন্ন্যাসী আসছিল, সে কে? সে কাদের অনুসরণ করছিল—আমাদের না শত্রুদের? কেন অনুসরণ করছিল, তার স্বার্থ কি? সেইই কি বেনামা পত্রলেখক? কেন সে আমাদের সাবধান ক'রে দিতে চায়, সে কি আমাদের বন্ধু? এমন অচিন বন্ধু কি বিস্ময়কর নয়?"

মানিক ফাপরে প'ড়ে বললে, "প্রশ্নে প্রশ্নে তুমি যে আমাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে হে!"

—"না ভাই, না! এ-সব প্রশ্ন আমি কেবল তোমাকেই করছি না, নিজেকেও করছি নিজে নিজেই। কিন্তু এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। তোমার কাছে আছে?"

—"উঁহুঁ!"

—"অতএব সুন্দরবাবু হাওয়ায় হাওয়ায় যে ষড়্‌যন্ত্রের কথা তুলেছেন, সেটা তাৎপর্যমূলক ব'লে মানতে হবে বৈকি!"

—"উত্তম, সুন্দরবাবুর নাকে শোঁকা ষড়্‌যন্ত্রের গন্ধকে স্বীকার করি নি ব'লে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। জয়ন্তও যদি সুন্দরবাবুর পক্ষ সমর্থন করে তাহ'লে একসঙ্গে দুইজনের প্রতিযোগিতা করবার সাধ্য আমার নেই।"
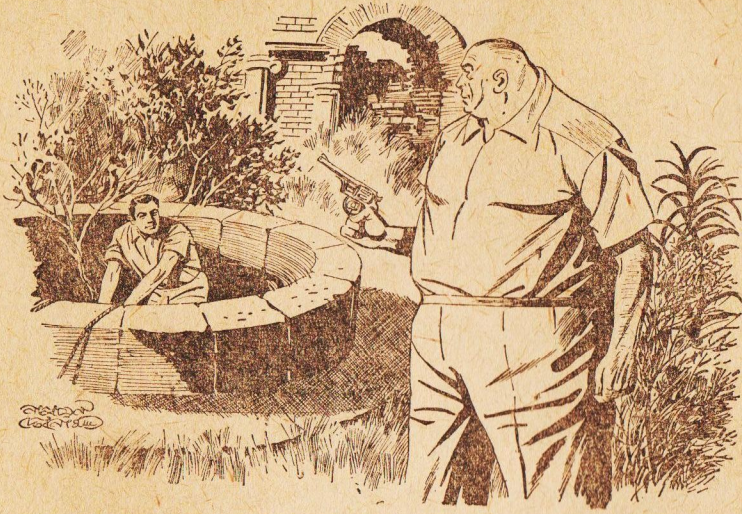
সুন্দরবাবু রিভলভার বার ক'রে মৃদুকণ্ঠে বললেন,··· [পৃষ্ঠা ৫৬৭

সুন্দরবাবু অভিমানের স্বরে বললেন, "মানিক, এখনো তুমি ঠাট্টার সুরে কথা কইছ! কিন্তু ভাই, আমি কি ন্যায্য কথাই বলি নি?"

মানিক এইবার গম্ভীর হ'য়ে বললে, "না সুন্দরবাবু, সব শুনে আমি এখন আপনার কথাতেই সায় দিচ্ছি। কিন্তু অতঃপর আমাদের কর্তব্য কি?"

জয়ন্ত বললে, "কর্তব্য আমি স্থির ক'রে ফেলেছি। আমাদের সকলের একসঙ্গে ইঁদারায় নামা চলবে না।"

—"তবে?"

—"অন্ততঃ একজনকে এখানে পাহারায় মোতায়েন থাকতে হবে।"

—"থাকবে কে?"

—"সুন্দরবাবু।"

সুন্দরবাবু চমকে উঠে বললেন, "হুম্! আমি? একলা?"

—"দোকলা পাবেন কাকে? মানিক কিছুতেই আমাকে ছাড়তে রাজী হবে না। আর আমিও তাকে ছাড়ব না, সে আমার ডানহাতের মত। আর বীরেন-বাবু এ-সব ব্যাপারে একেবারে কাঁচা, ওঁর এখানে থাকা না-থাকা সমান কথা।"

সুন্দরবাবু বললেন, "না, না, বীরেনবাবুকে আমিও চাই না। যদি কোন বিপদ ঘটে, ওঁকে সামলানোই দায় হ'য়ে উঠবে। কিন্তু আমার পক্ষেও এখানে একলা থাকাটা কি সমীচীন হবে?"

—"কেন হবে না? আপনি বহুযুদ্ধজয়ী সৈনিক। আপনার একহাতে রইল রিভলভার, আর একহাতে সংকেত-বাঁশী। বিপদ দেখলে দুটোই ব্যবহার করবেন। আমরাও তো হাতের কাছেই রইলুম—বাঁশী শুনেছি কি ছুটে এসেছি! এস মানিক, আসুন বীরেনবাবু!"

জয়ন্ত সর্বাগ্রে ইঁদারার ভিতরে গিয়ে নামল।

সুন্দরবাবু রিভলভার বার ক'রে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "জয় বিপদভঞ্জন মধুসূদন!"

(ক্রমশঃ)

মজার কথা

সুব্রত সেনগুপ্ত

দুটো পাগল পাগলা-গারদ থেকে সবে ছাড়া পেয়েছে। একজন ডাক্তার তাদের পেছনে রয়েছেন তারা সত্যিই সুস্থ হয়েছে কি না দেখবার জন্য। পাগল দুজন শুনল যে তারা নাকি সুস্থ হয়েছে। তখন একজন পাগল আর এক পাগলকে বলল, "আয়, একটা পরীক্ষা করে দেখা যাক, আমরা ভাল হয়েছি কি না।" এই বলে সে রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে সেটা অপর পাগলটাকে দেখিয়ে বলল, "বল তো এটা কি?"

"আহা, জানি না যেন!"

"আরে বলই না।"

"মোটরগাড়ি।"

এই শুনে প্রথম পাগলটি জবাব দিল, "আহা, দেখে শুনে বলা হল!"

ডাক্তারটি এই ব্যাপার দেখে আবার তাদের পাগলা-গারদে পুরলেন।

জগৎশেঠের রত্নকুঠী
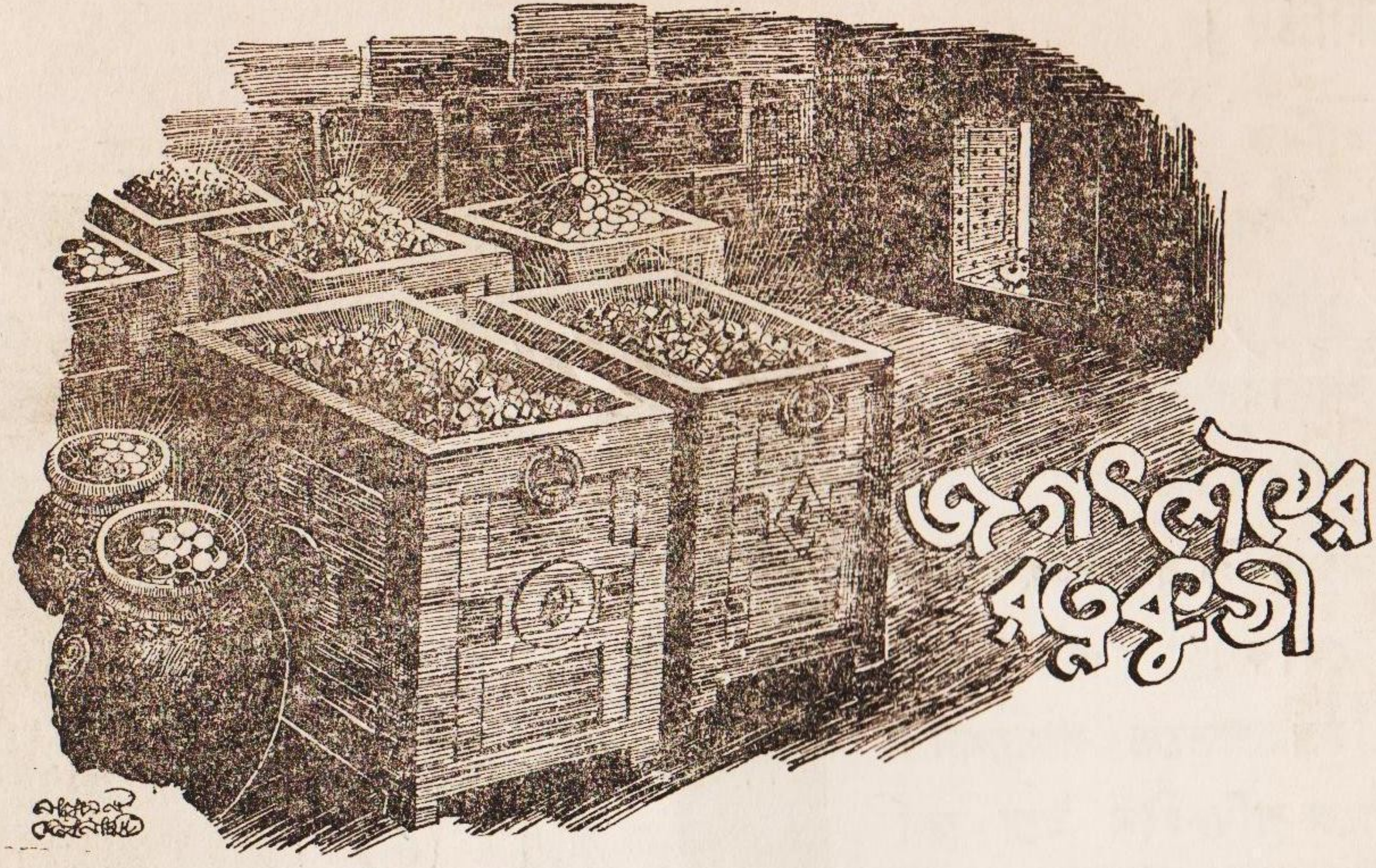
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

নবম অধ্যায়
রসাতলের কারাগার

(পূর্বানুবৃত্তি)

পশ্চিমের সম্ভ্রান্ত বাড়ির ইঁদারার মত ব্যবস্থা। বেড় রীতিমত বড়, সার সার সিঁড়ির ধাপ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে কিছুদূর পর্যন্ত। তারপরেই অবারিত শূন্যতা। এবং অল্পে অল্পে ঘনায়মান অন্ধকার।

মাঝে মাঝে টর্চের চাবি টিপলে দেখা যায় মানুষের অভাবিত ও বিরক্তিকর আবির্ভাবে ইঁদারার গায়ে দিকে দিকে হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে ছুটোছুটি করছে মাকড়সা, বিছে ও কাঁকড়াবিছে দলে দলে। আরো কত জাতের অজানা জীবের চোখে ফোটে বিদ্যুতের ঝলক। মন চমকে দেয় তক্ষকদের প্রতিবাদ। সর্বাঙ্গ ভয়ার্ত হ'য়ে ওঠে ভীষণ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে।

জয়ন্ত বলে, "শুনছ মানিক ?"

—"শুনছি।"

—"চন্দ্রনাথবাবুর অপার্থিব গর্জন !"

বীরেন ভয়ে কুঁচকে বলে, "ও মশাই, কামড়াবে না তো ?"

—"সেটা ওদের খুশি ! আর আমাদের বরাত !"

মানিক বলে, "নামছি তো নামছিই। বাবা, ইঁদারাটা কত গভীর ?"

—"অন্ধকার যেন নিরেট হ'য়ে উঠেছে। আর বেশী নামতে হবে না।"

তারপর আলো ফেলে দেখা গেল, রাশি রাশি অস্থি ছড়িয়ে প'ড়ে ইঁদারার তলদেশটা ভয়াবহ শুভ্রতায় ভরিয়ে তুলেছে।

জ্বলল দুটো লণ্ঠনের আলো। গুনে দেখা গেল নয়টা অস্থিসার নরমুণ্ড, সেগুলো কঙ্কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। সেই সব ওষ্ঠাধরের আবরণমুক্ত বিকট দন্তবিকাশ দেখলেই বুকটা ধড়াস্ ক'রে ওঠে আর প্রাণ মূর্ছিত হ'য়ে পড়তে চায় সেই সব দৃষ্টিহীন চক্ষুকোটরের বীভৎসতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

কাঁপতে কাঁপতে একটা নরমুণ্ডের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, "লোভী ধনীর মারাত্মক খেয়ালের খোরাক হবার জন্যে নয়-নয়জন হতভাগ্যের জীবনলীলা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এখানে ফুরিয়ে গিয়েছে—তাদের অন্তিম আর্তনাদের সঙ্গে মেশানো ছিল জীবনের যত অতৃপ্ত বাসনা। সুন্দরবাবুর মত মানলে আমিও বলতুম, তাদের অশান্ত আত্মারা আজও ঐ অস্থিস্তূপগুলোর মায়া ছাড়তে পারে নি, আজও তারা এই সংকীর্ণ অন্ধকার কারাগারে বন্দী হ'য়ে পুনর্বার দেহধারণের জন্যে তপস্যা করছে !"

হঠাৎ বীরেন সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল।

—"কি হ'ল বীরেনবাবু ?"

বীরেন কাঁপতে কাঁপতে একটা নরমুণ্ডের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে।

—"ওখানে কি ?"

—"ওর কোটরের মধ্যে চোখ জ্বলজ্বল করছে !"

জয়ন্ত বিস্মিত হ'য়ে দেখলে, সত্যই তাই—জ্বলন্ত চক্ষুকোটর ! জ্বলছে, একটু একটু নড়ছে ! কিন্তু সে ভয় পেলে না, হাতের টর্চের সাহায্যে নরমুণ্ডটাকে ঠেলে দিলে—কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল একটা ত্রস্ত টিকটিকি !

শুকনো হাসি হেসে মানিক বললে, "সত্যি ভাই জয়ন্ত, আমারও বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠেছিল ! এমনি ক'রেই লোকে ভূত দেখে !"

এখন তারা সত্যসত্যই এসে দাঁড়িয়েছে নিরবচ্ছিন্ন তমসাবৃত পাতালপ্রদেশে। তাদের চারিপাশ ঘিরে থমথম করছে নিঃসাড় মৃত্যুর মত বুকচাপা এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা এবং মানুষের কল্পনাতীত সেই নিদ্রায়মান ও প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে তাদের অনুচ্চ কণ্ঠস্বরগুলোও শোনাচ্ছিল কর্ণপটহভেদী দামামানির্ঘোষের মত।

জয়ন্ত ও মানিক লণ্ঠনদুটো মাথার উপরে উঁচু ক'রে তুলে ধরলে ভালো ক'রে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে।

প্রথমেই চোখে পড়ল গর্ভগৃহের লৌহকপাট; এত ছোট যে দ্বারপথ দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলে মাথা নামিয়ে হেঁট না হ'লে চলবে না।

জয়ন্ত সচকিতকণ্ঠে বললে, "একি ! দরজার পাল্লা দুখানা যে খোলা !"

মানিক বললে, "এ বোধহয় চন্দ্রনাথবাবুর কীর্তি ! গুপ্তধন পাওয়ার আনন্দে আকুল হ'য়ে তিনি যাবার সময়ে দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন।"

জয়ন্ত আশ্বস্ত হয়েছে ব'লে মনে হ'ল না। তবু মুখে বললে, "তাই হবে। তবে আজ যখন ইঁদারার জল শুকিয়ে গিয়েছে, দরজা খোলা থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।"

তারপর সে খুব মন দিয়ে দরজার কাছটা দেখতে দেখতে বললে, "দেখ মানিক, ইঁদারার এখানটা পাথর দিয়ে শক্ত ক'রে গড়া। আর ওস্তাদ কারিগররা পাথরের গায়ে এমন নিপুণ হাতে লোহার কপাট বসিয়েছে যে একফোঁটা জলও ভিতরে ঢুকতে পারবে না।"

মানিক বললে, "দরজা গড়তে নিশ্চয় খুব ভালো ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে। কত কাল জলের তলায় ডুবে ছিল, তবু মরচে ধরেনি।"

উদগ্র আগ্রহে ও দুঃসহ কৌতূহলে বীরেনের তখন আর তর সইছিল না। সে এগিয়ে গিয়ে বললে, "আসুন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি !"

জয়ন্ত বাধা দিয়ে বললে, "আরে মশাই, দাঁড়ান ! লণ্ঠনের সঙ্গে সকলে টর্চও ব্যবহার করুন। কে জানে ভিতরে কি বিপদ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে !"

তাড়াতাড়ি পিছোতে পিছোতে বীরেন বললে, "বিপদ ? কি বিপদ ?"

—"এই পাতালপুরীতে বহুকাল পরে দরজা খোলা পেয়ে এর ভেতরে শখের বাসা বাঁধতে পারে কেউটে, কি গোখরো, কি ময়াল সাপ ! কেউ বিষ ছড়ায়, কেউ পিষে মারে !"

আরো পিছিয়ে গেল বীরেন। শোনা গেল, তার অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল বিপৎকালে প্রথমেই যা মনে আসে সেই "বাবা" শব্দটি।

তিন-তিনটে সঞ্চরমান আলোকশিখায় সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে লাগল একখানা মাঝারি আকারের পাথুরে ঘরের এদিক এবং ওদিক। কিন্তু ভয়াল ময়াল বা কোন-জাতীয় বিষধর সরীসৃপ আত্মপ্রকাশ করলে না।

নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘরের ভিতরে পদার্পণ ক'রে জয়ন্ত বিস্মিত স্বরে বললে, "কিন্তু কোথায় আছে গুপ্তধন ? এ যে একেবারে খালি ঘর !"

বীরেন বললে, "এখানে এসেও মাটি কোপাতে হবে নাকি ?"

চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টি সঞ্চালন ক'রে যা দেখবার সব দেখে নিয়ে জয়ন্ত বললে, "মাটি ? কোথায় মাটি ? এখানে সব পাথর ! আমাদেরও পাথুরে কপাল !"

মানিক বললে, "আমরা নির্বোধ ! গাছে কাঁঠাল আছে ভেবেই গোঁফে তেল মাখিয়েছি, কিন্তু তার আগেই কাঁঠাল হয়েছে বুদ্ধিমানের হস্তগত !"

বীরেন হতাশভাবে বললে, "এ তাহ'লে প্রতাপ চৌধুরীর কাজ !"

জয়ন্ত বললে, "তাহ'লে মানতে হবে যে, প্রতাপ চৌধুরী হ'চ্ছে অত্যন্ত ত্বরিতকর্মা।"

মানিক বললে, "জয়ন্ত, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা সম্পূর্ণ খাতা আমরা পড়বার সুযোগ পাই নি, তার খানিকটা অংশ হস্তগত হয়েছে প্রতাপ চৌধুরীর আর সেই অংশটাই হ'চ্ছে হয়তো আসল অংশ। সেটুকু ছিঁড়ে নিয়ে প্রতাপ বাকি

ছুটে গিয়ে দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে…

কাগজগুলো তুচ্ছ ভেবে ফেলে দিয়ে গেছে!"

জয়ন্ত চিন্তান্বিত মুখে বললে, "কিন্তু—কিন্তু এক জায়গায় তবু খটকা থেকে যাচ্ছে!"

—"কোন্ জায়গায়?"

জয়ন্ত জবাব দেবার আগেই আচম্বিতে ঝনঝন শব্দে পাতালপুরীর সেই কক্ষটা ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠল।

সকলে সবিস্ময়ে সচকিত চক্ষে দেখলে, ঝন-ঝন-ঝনাৎ ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেল লৌহকপাট!

জয়ন্ত বেগে ছুটে গিয়ে দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দুই হাতে টানাটানি করতে লাগল, কিন্তু কপাট খুলল না, একটু নড়লও না। সে ফিরে দাঁড়িয়ে তিক্ত হাসি হেসে বললে, "মানিক, মানিক, রসাতলের কারাগারে আমরা বন্দী হলুম!"

(ক্রমশঃ)

জোড়া কথা

কুমারী পূর্ণিমারানী ঘোষ

ট্রেনে দুই ভদ্রলোকের কথা হচ্ছে। একজনের বাড়ি বীরভূম, আর একজনের বাঁকুড়া। বাঁকুড়াবাসী কথায় কথায় বললে, "আপনাদের দেশে যফলা আকার দিয়ে আবার ওকার দিয়ে বড্ড কথা বলে, না?"

বীরভূমবাসী বললে, "না, ত্যামন কিছু নয়। দু'এ্যাক্‌টো বলে। আপনাদের দেশে নাকি জোড়া কথা বলে?"

বাঁকুড়াবাসী বললে, "ছোটলোক টোটলোকরা একটু বলে বৈকি, তবে ভদ্দলোক টদ্দলোকে বলে না।"

জগৎশেঠের রত্নকুম্ভ
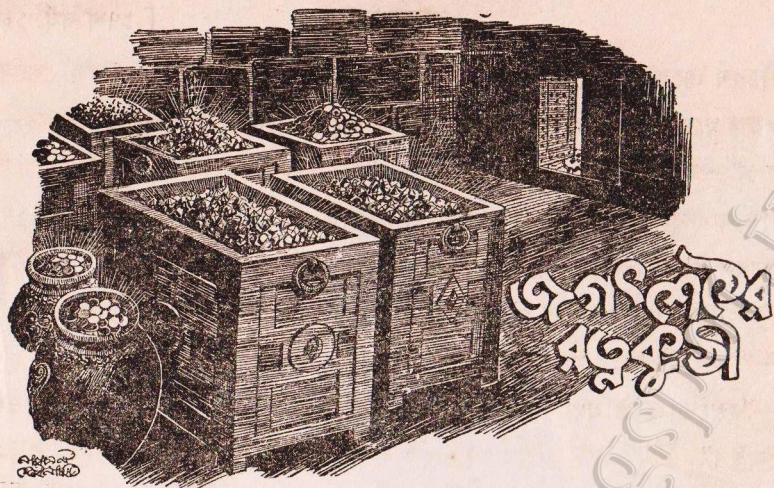
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

দশম অধ্যায়

অঘটন সংঘটন রহস্য

(পূর্বানুবৃত্তি)

খানিকক্ষণ কারুর মুখ দিয়েই হ'ল না বাক্য-নিঃসরণ।

সেই ভূগর্ভগৃহের স্তব্ধতা এমন নিবিড় যে, হাতঘড়ির ক্ষীণ টিকটিক শব্দকেও মনে হয় উচ্চরোল!

জয়ন্ত শুধোলে, "ঘড়িতে ক'টা বেজেছে?"

মানিক দেখে বললে, "সাড়ে পাঁচটা।"

—"হুঁ। বাইরের পৃথিবী এখন সন্ধ্যার ছায়াছবির জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে। তারপর ফুটবে কালো রাত। তারপর আবার আসবে রঙীন প্রভাত। তারপর আবার হবে জ্যোতির্ময় সূর্যোদয়। কিন্তু আমরা আবার তা দেখতে পাব না। কি বল মানিক?"

—"লণ্ঠনদুটোর তেল কাল সকালেই বোধহয় ফুরিয়ে যাবে। টর্চের আলো দেবার শক্তিও বেশীক্ষণ নয়। তারপর আমরা দেখব খালি অন্ধ-করা অন্ধকার। যতক্ষণ বাঁচব ততক্ষণ।"

—"কিন্তু সে কতক্ষণ মানিক? আমাদের সঙ্গে না আছে জল, না আছে খাবার।"

বীরেন একেবারে বোবা।

জয়ন্ত ঘরের ভিতরে এক চক্কর ঘুরে এসে বললে, "কিন্তু দরজা বন্ধ করতে পারে কে?"

মানিক বললে, "এক পারেন সুন্দরবাবু। কিন্তু এমন সাংঘাতিক কৌতুক তিনি করবেন ব'লে বিশ্বাস হয় না।"

—"আর পারে প্রতাপ চৌধুরী।"

—"কিন্তু ইঁদারার মুখে পাহারায় আছেন সুন্দরবাবু।"

—"হয়তো তিনিও বন্দী। কিংবা নিহত। প্রতাপ চৌধুরীর নরহত্যায় আপত্তি নেই।"

—"আমরা কিন্তু উপর থেকে রিভলভারের বা সংকেত-বাঁশীর আওয়াজ শুনতে পাই নি। হয়তো উপর থেকে কোন আওয়াজই এত নীচে পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না।"

—"কিংবা সুন্দরবাবু রিভলভার কি বাঁশী ব্যবহার করবার সময় পান নি।"

—"অমনি একটা কিছু হয়েছেই। কিন্তু ফল একই। আমাদের মরতে হবে।"

বীরেন কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, "এইভাবে মরব ব'লেই কি জন্মেছিলুম? অন্ধকারে, অনাহারে, দিনে দিনে, তিলে তিলে?"

জয়ন্ত বললে, "প্রতাপ চৌধুরী আরো দুবার আমাদের যমালয়ে পাঠাবার জন্যে বন্দী করেছিল। দুবারই আমাদের রক্ষা করেছিল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তি।"

—"কিন্তু এবারে তার পুনরভিনয়ের কোন সম্ভাবনাই দেখছি না।"

—"মানিক, চিরদিনই আমি নিয়তিবাদী। আজও নিয়তির উপরে নির্ভর করা ছাড়া আমাদের আর কোনই উপায় নেই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে মানিক বললে, "তাই বটে।"

আবার কিছুক্ষণব্যাপী নীরবতা। আবার কানে জাগে হাতঘড়ির টিক-টিক-টিক-টিক।

জয়ন্ত বললে, "একটু আগেই যা বলেছিলুম। প্রতাপ চৌধুরীর যুদ্ধকৌশলের কথা। তার পদ্ধতি কিছুমাত্র বদলায় নি। সে নিজে দেখা দেয় না, কিন্তু শত্রুদের বন্দী করে। সেরা শিল্পীদের পদ্ধতি বদলায় না। অপরাধের আর্টে প্রতাপ চৌধুরীকে সেরা শিল্পী ব'লে মানতেই হবে।"

বীরেন ভাঙা-ভাঙা স্বরে বললে, "জয়ন্তবাবু, এই কি অপরাধের আর্ট নিয়ে আলোচনা করবার সময়?"

জয়ন্ত শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললে, "তা ছাড়া আর কি করবেন ভাই?"

—"আর কিছুই করবার নেই?"

—"কিছু না, কিছু না!"

—"ভালো ক'রে দেখেছেন?"

—"কি?"

—"দরজাটা সত্যই বন্ধ কি না?"

—"আপনার কি সন্দেহ হ'চ্ছে?"

—"কি জানি, যদি—"

—"বেশ, আপনিও একবার টেনে দেখুন না!"

—"কিছু না, কিছু না!"

—"তা একবার দেখলে ক্ষতি কি?"

—"কোন ক্ষতি নেই। কিছু না করার চেয়ে একটা কিছু করা ভালো। যান, আপনিও দরজা ধ'রে টানাটানি ক'রে আসুন। খানিকটা সময় তবু কাটবে।"

বীরেন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল জীবনহীন যন্ত্রচালিত পুতুলের মত—তার মুখে নেই কোনরকম উৎসাহের ভাব। জয়ন্ত ও মানিক তার দিকে ফিরেও তাকালে না।

বীরেন আংটা ধ'রে খুব জোরে এক টান মারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে হড়-হড় ঝন-ঝন ক'রে বন্ধ দরজার পাল্লা আবার খুলে গেল!

শব্দ শুনে চমকে জয়ন্ত ও মানিক মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে। নিজেদের

চোখকেও তারা বিশ্বাস করতে পারলে না, ভাবলে তারা জেগে-জেগেই দেখছে কোন অসম্ভব স্বপ্ন !

না এ ভোজবাজি—বীরেন জাদুর খেলা জানে ?

বীরেনও হতভম্ব—তার মুখ দিয়ে হ'ল না বাক্যস্ফূর্তি !

জয়ন্ত আচ্ছন্নের মত বললে, "হ্যাঁ মানিক, আমি ভুল দেখছি না তো ? সত্যিই কি দরজাটা খুলে গেছে ?"

দুই হাতে দুই চোখ কচলে আর একবার ভালো ক'রে দেখে মানিক বললে, "দরজা তো খোলাই রয়েছে দেখছি !"

—"কিন্তু আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, দরজা ছিল বাহির থেকে বন্ধ !"

বীরেন বললে, "না, বন্ধ ছিল না ! আমি একবার টানতেই খুলে গেল !"

—"আর আমি একবার দু'বার নয়, প্রাণপণে টেনে দেখেছি বার বার !"

মানিক বললে, "তাহ'লে একটু আগে তুমি যা বলছিলে—এ হ'চ্ছে সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তির লীলা !"

—"না মানিক, কেউ বাহির থেকে দরজাটা আবার খুলে দিয়েছে !"

—"কে খুলে দেবে ? সুন্দরবাবু ? কিন্তু সুন্দরবাবু কি আমাদের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর রসিকতা করবেন ?"

—"আমার বিশ্বাস হয় না। দেখ তো, বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না।"

মানিক বাইরে ছুটে গেল এবং তারপর চেঁচিয়ে বললে, "এখানে কেউ নেই। কেবল একটা কৌতূহলী তক্ষক খবরদারি করবার জন্যে ইঁদারার গা ব'য়ে নেমে এসেছিল, আমাকে দেখে আবার উপর দিকে চম্পট দিলে !"

জয়ন্ত বেকুবের মত মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "মানিক, সত্যসত্যই একটা কোন অঘটন ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কি তা আমি বুঝতে পারছি না !"

—"হয়তো সুন্দরবাবু এ অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। উপরে চল।"

—"তাই চল। রত্নকুঠী তো রত্নহীন, এখানে আর থেকেই বা লাভ কি ?"

পাতালের অন্ধকার উদর ছেড়ে তারা এসে উঠল পৃথিবীর উপরে রাতের অন্ধকারের কোলে। সর্বাঙ্গে নিবিড় কালিমা মেখে জঙ্গলের বড় বড় গাছগুলো কি

যেন নৈশ রহস্য নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কানাকানি করছে মর্মর-ভাষায়। থেকে থেকে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে কূলে কূলে লিখে চলেছে অদূরবর্তিনী গঙ্গা তার মুখর তরঙ্গকাহিনী।

জয়ন্ত ডাকলে, "সুন্দরবাবু, সুন্দরবাবু ! অন্ধকারে কোথায় গা ঢেকে পাহারা দিচ্ছেন ?"

কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না।

মানিক বললে, "সুন্দরবাবু ঘুমিয়ে পড়েন নি তো ?"

জয়ন্ত বললে, "সেটা সম্ভব নয়। আমার মন আবার বলছে, একটা কোন অঘটন ঘটেছেই !"

—"কি অঘটন ?"

—"খোলা দরজা আপনি বন্ধ হয়, বন্ধ দরজা আপনি খুলে যায়, সুন্দরবাবু পাহারা না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকেন, এ সবই তো অঘটন ! মানিক, তুমি একদিকে যাও, বীরেনবাবু, আপনি আর একদিকে যান, আর আমি যাই এই দিকে। দেখা যাক সুন্দরবাবুকে খুঁজে পাই কি না !"

মাঠের ও নদীর মধ্যবর্তী এই জঙ্গুলে জায়গাটায় রাত-আঁধারে লোকজন পদার্পণ করে না। জমি এবড়োখেবড়ো এবং খানা-ডোবায় দুর্গম। সহজে সুন্দরবাবুর পাত্তা পাওয়া যাবে ব'লে কেউ মনে ভাবে নি। কিন্তু তাদের সৌভাগ্যক্রমে একটুখানি অগ্রসর হ'য়েই সফল হ'ল খোঁজাখুঁজি।

একটা ঝোপ দুলছে ঘনঘন। যেন কোন জন্তু তার মধ্যে ঢুকে ছটফট করছে। সেই দিকে আকৃষ্ট হ'ল মানিকের দৃষ্টি।

ঝোপের খানিকটা এক হাতে সরিয়ে আর এক হাতে তার মধ্যে আলো ফেলে মানিক সচমকে দেখলে, সেখানে ভূশয্যাশায়ী সুন্দরবাবু একসঙ্গে রজ্জুবদ্ধ পদযুগল ছুড়ছেন আর ছুড়ছেন ! কেবল পা নয়, তাঁর বাহুযুগলও দড়ি দিয়ে পিছমোড়া ক'রে বাঁধা এবং মুখ ও চোখের উপরে রয়েছে কাপড়ের বন্ধনী !

সুন্দরবাবুকে তাড়াতাড়ি বন্ধনমুক্ত করতে করতে মানিক ফুকরে উঠল, "জয়ন্ত, জয়ন্ত ! সুন্দরবাবুকে পেয়েছি !"

সুন্দরবাবুর বিপুল ভুঁড়ি ফুলতে ও চুপসে যেতে লাগল স্যাকরার হাপরের মত।

ভূশয্যাশায়ী সুন্দরবাবু রজ্জুবদ্ধ পদযুগল ছুড়ছেন··· [পৃষ্ঠা ৭১৭

বেশ কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে হাঁপিয়ে নিয়ে তিনি সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করলেন তাঁর সেই চিরপ্রিয় শব্দ—"হুম্!"

এতক্ষণে সুন্দরবাবু বাক্‌শক্তি ফিরিয়ে পেয়েছেন বুঝে জয়ন্ত শুধোলে, "আপনার এ দশা করলে কে?"

—"চোখে দেখি নি, তবে পরে কানে শুনে আন্দাজ করেছি।"

—"কিছুই বুঝলুম না।"

—"এখন বেশী বুঝিয়ে বলবার শক্তি নেই। তবে আসল কথাগুলো শাটে বলতে পারি। তোমরা ইঁদারায় নেমে গেলে। আমি ঠাঁয় ব'সে ব'সে পাহারা দিতে লাগলুম। কোথাও কারুর সাড়া পর্যন্ত নেই, অথচ আচমকা পশ্চাদ্‌ভাগ থেকে আমার কানের ঠিক পিছনে কে এসে বেমক্কা মুষ্টিপ্রহার করলে—মুষ্টিযোদ্ধারা যাকে বলে 'র‍্যাবিট পাঞ্চ'! এরকম ঘুষি মানুষকে তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান ক'রে দেয়—আমিও একেবারে বেহুঁশ! জ্ঞান হ'লে পর দেখি আমার এই অবস্থা! আমার চোখ বন্ধ, মুখ বন্ধ, আমি চলৎশক্তিহীন! কেবল কান খোলা ছিল ব'লে শুনতে পাচ্ছিলুম। শুনলুম অনেকগুলো পায়ের শব্দ। শুনলুম, কে বললে—'বড়বাবু, লোহার দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছি।' তারপর বোধহয় বড়বাবুই বললে—'দড়ির সিঁড়িটা টেনে তুলে

রেখে দে!' আমাকেও কারা হিড়হিড় ক'রে টেনে এই ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে রাখলে। তারপর বোধকরি সেই বড়বাবুই বললে—'চল্ এইবারে! আর কোন খলিফা আমাদের পিছনে জ্বালাতে আসবে না, আমরা নিশ্চিন্ত!' তারপর পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। সব নিঝুম।" সুন্দরবাবু থামলেন। আবার হাঁপাতে লাগলেন।

—"তারপর আর কিছু বলবার নেই?"

—"নেই মানে? আলবৎ আছে! তারপরেই তো আসল বলবার কথা। কিন্তু একটু রও ভাই! আর একটু না হাঁপিয়ে জুত ক'রে বলতে পারছি না—আমাতে কি আর আমি আছি দাদা?"

মিনিটখানেক আরো খানিকটা হাঁপিয়ে নিয়ে ও আরো খানিকটা প্রকৃতিস্থ হ'য়ে সুন্দরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তারপর কি হ'ল শোনো! খানিকক্ষণ ঝিঁঝিঁপোকাগুলোর একটানা গান ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। তারপর আশপাশের ঝিঁঝিঁপোকাগুলো আচমকা গান বন্ধ ক'রে দিলে। আবার একজন মানুষের পায়ের শব্দ আমার পাশেই এসে থামল। আমি তো 'নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু'র উপরেও আরো বেশী আড়ষ্ট হ'য়ে গিয়ে ভাবতে লাগলুম—এই রে, সেরেছে! এবারে বুঝি আমার প্রাণ নিয়েই টানাটানি করতে এল! তারপরেই শুনি—না, সে সব নয়, এ আবার নতুন ব্যাপার, যাকে বলে কল্পনাতীত! কে একজন আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে—'সুন্দরবাবু, ভালো ক'রে শুনে রাখুন! আমি আবার দড়ির সিঁড়িটা ইঁদারার ভেতরে ঝুলিয়ে রেখেছি আর লোহার কবাটও খুলে দিয়েছি। আপনার কোন ভয় নেই, জয়ন্তবাবুরা এখনি এসে আপনাকে উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। তাঁদের বলবেন, প্রতাপ চৌধুরী তার দলবল নিয়ে বীরেনবাবুদের সাবেক বাড়ির দিকে গিয়েছে।' তারপর আবার পায়ের শব্দ, আবার সব চুপচাপ, আবার শুরু হ'ল ঝঞ্ঝাটে ঝিঁঝিঁদের ঝাঁজরা গলায় ঝিমিঝিমি চীৎকার! সেই একঘেয়ে ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার সর্বাঙ্গ যেন ঝিন-ঝিন আর মাথাটাও ঝিম-ঝিম করতে লাগল। কিন্তু সেই অবস্থাতেই আমি আন্দাজ করতে পারলুম, দুরাত্মারা তোমাদের বন্দী ক'রে দড়ির সিঁড়ি উপরে তুলে নিয়েছিল! তার কতক্ষণ পরে শুনলুম, তোমাদের ডাকাডাকি! আমি তো ব্রাদার, প'ড়ে

গেলুম মহা ফাঁপরে,—কি ক'রে তোমাদের জানাই যে আমার পক্ষে এখন সাড়া বা দেখা দেওয়া দুইই অসম্ভব! কিন্তু হাজার হোক আমি হ'চ্ছি গিয়ে প্রাচীন সৈনিক, ঝাঁ ক'রে বুদ্ধি খুলে গেল! বুঝে ফেললুম, আমি চলতে না পারলেও বাঁধা পাদুটো ছুঁড়ে ছুঁড়ে অনায়াসেই ঝোপ নেড়ে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি! তারপর আর কি—হুম্!"

সুন্দরবাবুর শেষ কথাগুলো জয়ন্ত যেন শুনছিল না, সে হঠাৎ চিন্তামগ্ন হ'য়ে পড়ল।

মানিক বললে, "জয়ন্ত, সব-শেষে যে লোকটা সুন্দরবাবুর কাছে এসেছিল, সে নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসী! কে সে জয়ন্ত, তাকে আমরা চিনি না, সে কিন্তু আমাদের সকলকেই চেনে, আর তার দৌলতেই আজ আমরা রসাতলের কারাগার থেকে ছাড়ান্ পেয়েছি!"

জয়ন্ত হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সানন্দে চেঁচিয়ে বললে, "আবার তার অনুগ্রহেই আজ প্রতাপ চৌধুরী সদলবলে ধরা পড়তে পারে!"

মানিক বললে, "বুঝেছি তোমার মনের কথা! তুমি এখনি বীরেনবাবুর বাড়ির দিকে ধাওয়া করতে চাও?"

—"নিশ্চয়! এ সুযোগ কে ছাড়ে?"

—"কিন্তু দুটো মুশকিল আছে। প্রথমতঃ, সেখানে পায়ে হেঁটে গিয়ে পৌঁছতে রাত কাবার হ'য়ে যেতে পারে। ততক্ষণ কি তারা থাকবে?"

—"আর দ্বিতীয় মুশকিল?"

—"দলে তারা ভারী।"

—"মা ভৈঃ! উঠুন সুন্দরবাবু! স্থানীয় পুলিসের থানার দিকে দ্রুত পদচালনা করুন। আপনি সম্প্রতি অবসর নিলেও বাংলাদেশের পুলিস বিভাগে সুপরিচিত ব্যক্তি। খবর দিন, বিখ্যাত ডাকাত, হত্যাকারী আর ফেরারী আসামী প্রতাপ চৌধুরীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে সাহায্য প্রার্থনা করুন। প্রতাপকে ধরবার জন্যে সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই মস্ত সুখবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিসের তৎপরতা

তিনগুণ বেড়ে উঠবে। একদল বন্দুকধারী সেপাই চাই। যেমন ক'রে হোক, সকলকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে দু-তিনখানা মোটরগাড়িও দরকার!"

মানিক বললে, "এ সব আয়োজন করতে করতেও রাত পুইয়ে যেতে পারে!"

—"থাক। প্রতাপ চৌধুরী আজ বীরেনবাবুর বাড়িতেই রাত কাটাবে ব'লে মনে হয়। তাদের বিশ্বাস আমরা এখনো বন্দী, তারা নিরাপদ।"

(ক্রমশঃ)

সরষে ফুল

মুরারিমোহন বিট

সরষে ফুল সরষে ফুল
হলুদ-রঙা সরষে ফুল,
শোন্‌রে ভজা, ঠিক যেন রে
সোনায় গড়া কানের দুল!

সোনারপুরে মামার ক্ষেতে
সরষে ফুলের সোনার ঢেউ
দেখলে পরে রূপের চমক
পারবে নাকো ভুলতে কেউ!

বল্‌লি কিরে? দেখিস্ নিকো
সরষে ফুল কেমনতরো?
মামার ক্ষেতে যাবার তরে
প্রাণটা তোর কাঁদছে বড়?
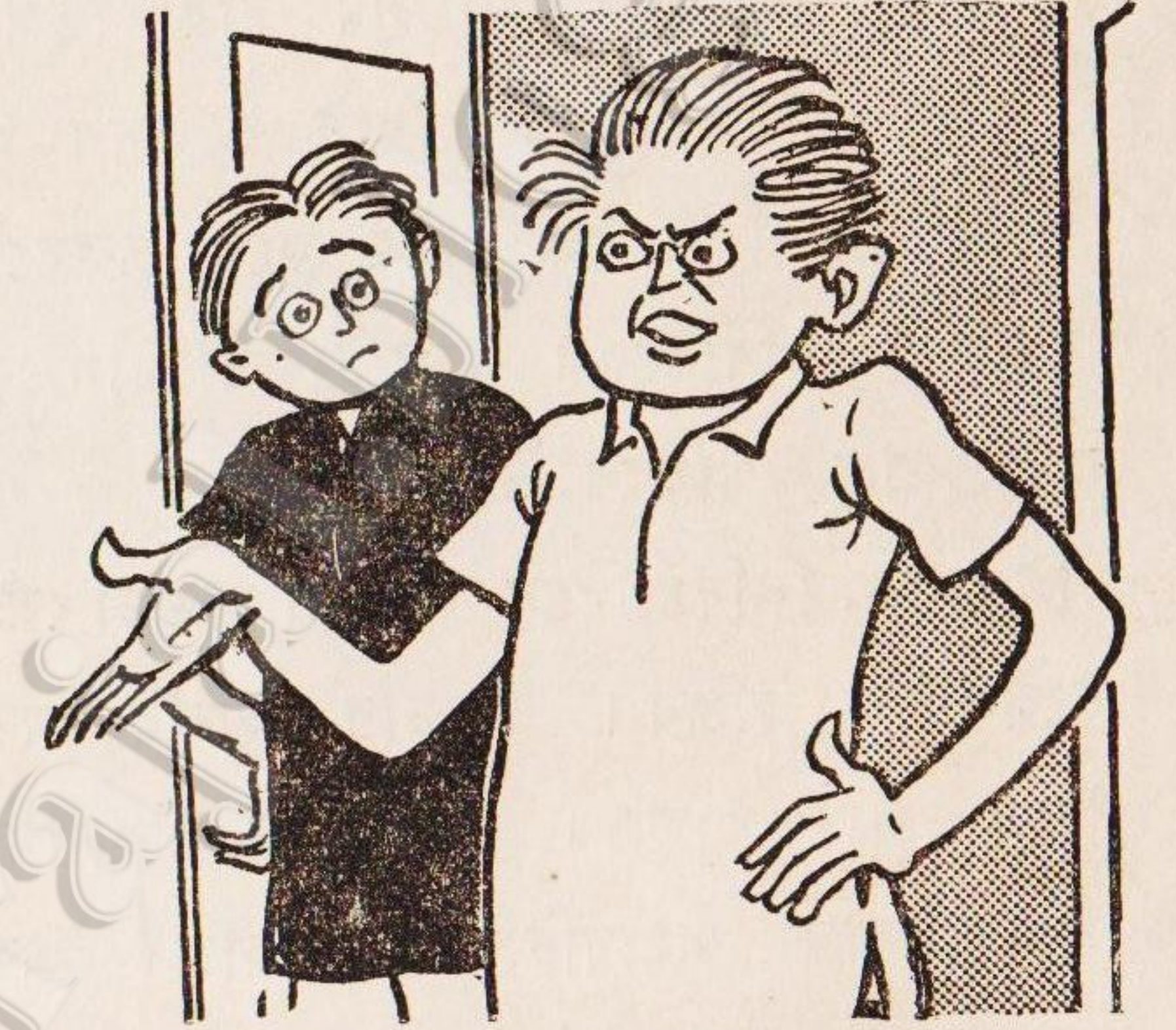
শোন্‌রে ভজা, বলছি তবে
নাই-বা গেলি ভিন্-গাঁয়েতে—
সরষে ফুলের নাচনখানা
দেখাই যদি এইখানেতে?

চক্ষু বুঁজে সামনে দাঁড়া
বলছি তোরে নয়কো ভুল,
একটি কষে গাঁট্টা লাগাই
দেখবি চোখে সরষে ফুল!

জগৎশেঠের রত্নকুঠী
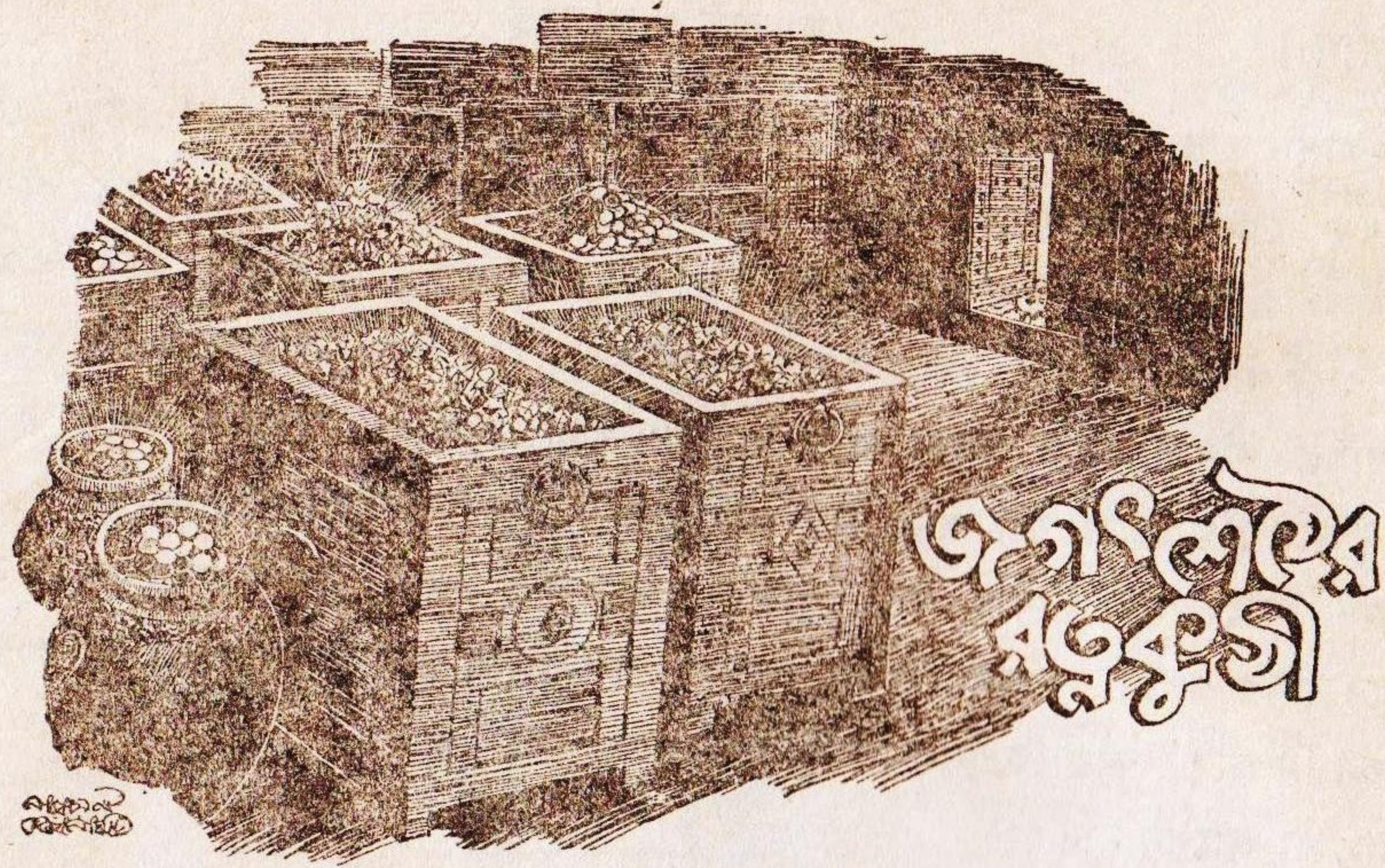
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

একাদশ অধ্যায়

প্রতাপ চৌধুরীর শাগরেদ

(পূর্বানুবৃত্তি)

সে হচ্ছে রাত্রি ও দিবসের মিলনলগ্ন। আকাশ নিবিয়ে দিচ্ছিল তারার বাতি, বিদায়ী আঁধার আসর ছেড়ে স'রে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে এবং উদয়াচলে চলছিল তখন দীপ্তোজ্জ্বল রঙের খেলার মোহনীয় আয়োজন! বাতাসে নূতন দিনের ঠাণ্ডা ছোঁয়া এবং বিহঙ্গরা রচনা করছিল আলোকোৎসবের বন্দনাসংগীত। চিরদিনই আসে এই অন্ধকারের পরে এই আলোর পালা, কিন্তু কখনো একঘেয়ে মনে হয় না এর তাজা মাধুর্যটুকু।

কিন্তু মাধুর্যের মাঝখানেও, এই সৌন্দর্যের কাব্যলোকেও মানুষ করে ছন্দভঙ্গ। সেই সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে আজ বীরেনবাবুর বসতবাড়ির চারিপার্শ্বে। সেখানে কোন রক্তাক্ত নাট্যাভিনয়ের মহলা চলছে।

পাছে অপরাধীরা সাড়া পায়, সেই ভয়ে ঘটনাস্থল থেকে খানিক তফাতে মোটর থামিয়ে পুলিসের লোকরা চুপিচুপি গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অধিকাংশই তখনও শয্যার আশ্রয় ছাড়ে নি। মাত্র কয়েকজন বয়স্ক লোক সবে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে এবং গৃহস্থদের কয়েকজন বৌ-ঝি কলসী কাঁখে নিয়ে চলেছে এ-বাড়ির ও-বাড়ির পুকুরঘাটে।

হঠাৎ সকলে সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখলে, পুলিসবাহিনী এসে বাগচী-বাড়ির চারিদিক ঘিরে ফেললে। গ্রামের পুরুষরা বিস্ফারিত নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল, মেয়েদের আর জলকে যাওয়া হ'ল না, শূন্য কলস নিয়ে ভীত-চকিত চক্ষে যে যার বাড়ির দিকে ফিরে চলল দ্রুতচরণে।

বাগচীদের অর্থাৎ বীরেনবাবুদের বাড়িখানা ছিল একটা ফর্দা জায়গার মাঝখানে। সেকেলে তিনমহলা বাড়ি। বাড়ি ঘিরে আগে ছিল যে বাগান, তা এখন পরিণত হয়েছে ছোটখাটো একটি মাঠে। বাড়ির সীমানা নির্দেশের জন্যে বেড়া দেওয়া আছে বটে, কিন্তু ফটকের বাধা নেই, গ্রামের লোকজনরাও অনায়াসে সীমানার ভিতরে এসে মস্ত পুকুরটার জল ব্যবহার করে।

"দরজা খোলো। নইলে আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব।" [পৃষ্ঠা ৭৮৪

সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেনকে নিয়ে জয়ন্ত আত্মগোপন ক'রে পিছনদিকে অবস্থান করতে লাগল, থানার দারোগাবাবু কতক লোক নিয়ে বাড়ির সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বাকি লোকদের মোতায়েন রাখলেন চারিদিকে পাহারা দেবার জন্যে।

নিরাপদ ব্যবধানে থেকেও বাড়ির যতটা কাছে যাওয়া যায় ততটা কাছে গিয়ে দারোগাবাবু গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন, "বাড়ির ভেতরে কে আছ? বাইরে বেরিয়ে এস।"

এতক্ষণ দোতালার একটা জানালায় জেগে ছিল একখানা মুখ। দূর থেকে সে লক্ষ্য করছিল পুলিসের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু দারোগাবাবুর নির্দেশ-বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখখানা আর দেখা গেল না।

কয়েক মিনিট কাটল। সদর দরজাও খুলল না বা বাড়ির ভিতর থেকেও এল না কোন সাড়াশব্দ।

দারোগাবাবু আবার হাঁকলেন, "দরজা খোলো। নইলে আমরা দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকব।"

তখনও কেউ সাড়া দিলে না।

মিনিট-দুয়েক অপেক্ষা ক'রে দারোগাবাবু চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন, "ভাঙো তবে দরজা। যে বাধা দেবে তাকেই গুলি ক'রে কুকুরের মত মেরে ফেলবে।"

বাড়ির ভিতর থেকে কে বললে, "দরজা ভাঙতে হবে না। আমরা বাধা দেব না, আত্মসমর্পণ করব।"

—"উত্তম! বেরিয়ে এস একে একে।"

দরজা খুলে গেল। পরে পরে নয়জন লোক বাইরে এসে দাঁড়াল—প্রত্যেককে দেখলেই দুর্দান্ত ও দুশমন ব'লে চিনতে দেরি হয় না। প্রত্যেকের হাতে পরিয়ে দেওয়া হ'ল লোহার হাতকড়া। তখন প্রত্যেকেরই জামাকাপড়ের ভিতর থেকে বেরুলো কোন-না-কোন মারাত্মক অস্ত্র।

কুখ্যাত প্রতাপ চৌধুরী সদলবলে এমন শান্তশিষ্টের মত ধরা দিলে দেখে জয়ন্তের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না, সে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এসে বন্দীদের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে ব'লে উঠল, "কোথায় প্রতাপ চৌধুরী? তোমরা কেউ প্রতাপ চৌধুরী নও!"

বন্দীদের একজন হেসে বললে, "আমরা কেন প্রতাপ চৌধুরী হ'তে যাব? বাপ মা আমাদের অন্য নাম রেখেছে!"

দারোগাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "চোপরাও বদমাশ! আবার রসিকতা হ'চ্ছে? বল্ কোথায় প্রতাপ চৌধুরী?"

—"জানি না। প্রতাপ চৌধুরী ব'লে কারুকে আমরা চিনি না।"

জয়ন্ত বললে, "দারোগাবাবু, আমার সঙ্গে কিছু লোক দিন। বাড়ির ভিতরটা খুঁজে দেখব।"

তন্ন তন্ন ক'রে তল্লাশের পরেও প্রতাপ চৌধুরীকে পাওয়া গেল না।

দেখা গেল, খিড়কির দরজাটা খোলা। সন্দেহজনক! খিড়কি খোলা কেন?

ভাবতে ভাবতে জয়ন্ত বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে সেখানটা গাছপালায় আচ্ছন্ন। অল্প দূরেই পুকুরের একটা ঘাট।

জয়ন্ত বললে, "দেখ মানিক, প্রথম ভোরের আধা-অন্ধকারে কেউ যদি এই ছায়া-ঢাকা পথ দিয়ে পুকুরঘাটে যায়, তাহ'লে সহজে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।"

মানিক জিজ্ঞাসু চোখে বললে, "কি বলতে চাও তুমি?"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে ঘাটের দিকে অগ্রসর হ'ল। এদিকে ওদিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

একজন আধবুড়ো পাহারাওয়ালা খানিক দূরে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

"একটু আগে এখানে কোন লোককে দেখেছ?"

তার কাছে গিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "একটু আগে এখানে কোন লোককে দেখেছ?"

—"কোন লোক? পুরুষমানুষ? না।"

—"তবে কি এখানে কোন স্ত্রীলোক ছিল?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। গাঁয়ের কোন স্ত্রীলোক। মেটে কলসীতে জল নিতে এসেছিল—এখানে আসতে আসতে এমন অনেক মেয়েকেই তো দেখলুম!"

—"তারপর?"

—"তারপর পুলিস দেখে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পালিয়ে গেল!"

—"ঘোমটায় মুখ ঢেকে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কোন্ দিকে গেল?"

বাড়ির পিছনদিকের একটা পায়ে-চলা পথ দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, "ঐদিকে।"

—"কেন তুমি তাকে ছেড়ে দিলে?"

—"সে কি বাবু? আমরা এই বাড়ির ভিতরকার দুশমনদের ধরতে এসেছি, গাঁয়ের ভদ্দরলোকের মেয়ে ধরব কেন? সে তো বাড়ির ভেতরেও ছিল না।"

—"ঠিক দেখেছ?"

—"ঠিক দেখেছি। মেয়েমানুষটি কাঁকালে কলসী নিয়ে নীচে থেকে উঠেছিল পুকুরের ঘাটের উপরে।"

জয়ন্ত ফিরে বললে, "বীরেনবাবু, এই পায়ে-চলা পথটা কি গাঁয়ের দিকে গিয়েছে?"

বীরেন বললে, "না, গঙ্গার দিকে। ঐ বাঁশঝাড়টার পরেই কলাবাগান, তার পরেই গঙ্গা—বাড়ির দোতালা থেকে দেখা যায়।"

জয়ন্ত বললে, "এখন আর পরিতাপ ক'রে লাভ নেই। আমাদের এত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল!"

সুন্দরবাবু চমকিত মুখে বললেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, তুমি কি বলতে চাও সেই স্ত্রীলোকটা—"

—"স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। প্রতাপ চৌধুরী নারীর ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে পাহারাওয়ালার চোখে ধুলো দিয়েছে। সে পালাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে, এখন আর তাকে ধরবার উপায় নেই, তবু ওদিকটা একবার ঘুরে আসি চলুন!"

সবাই দ্রুত পদচালনা করলে, তারপর আচম্বিতে দেখলে এক কল্পনাতীত অদ্ভুত দৃশ্য!

(ক্রমশঃ)

জগৎশেঠের রত্নকুঠী
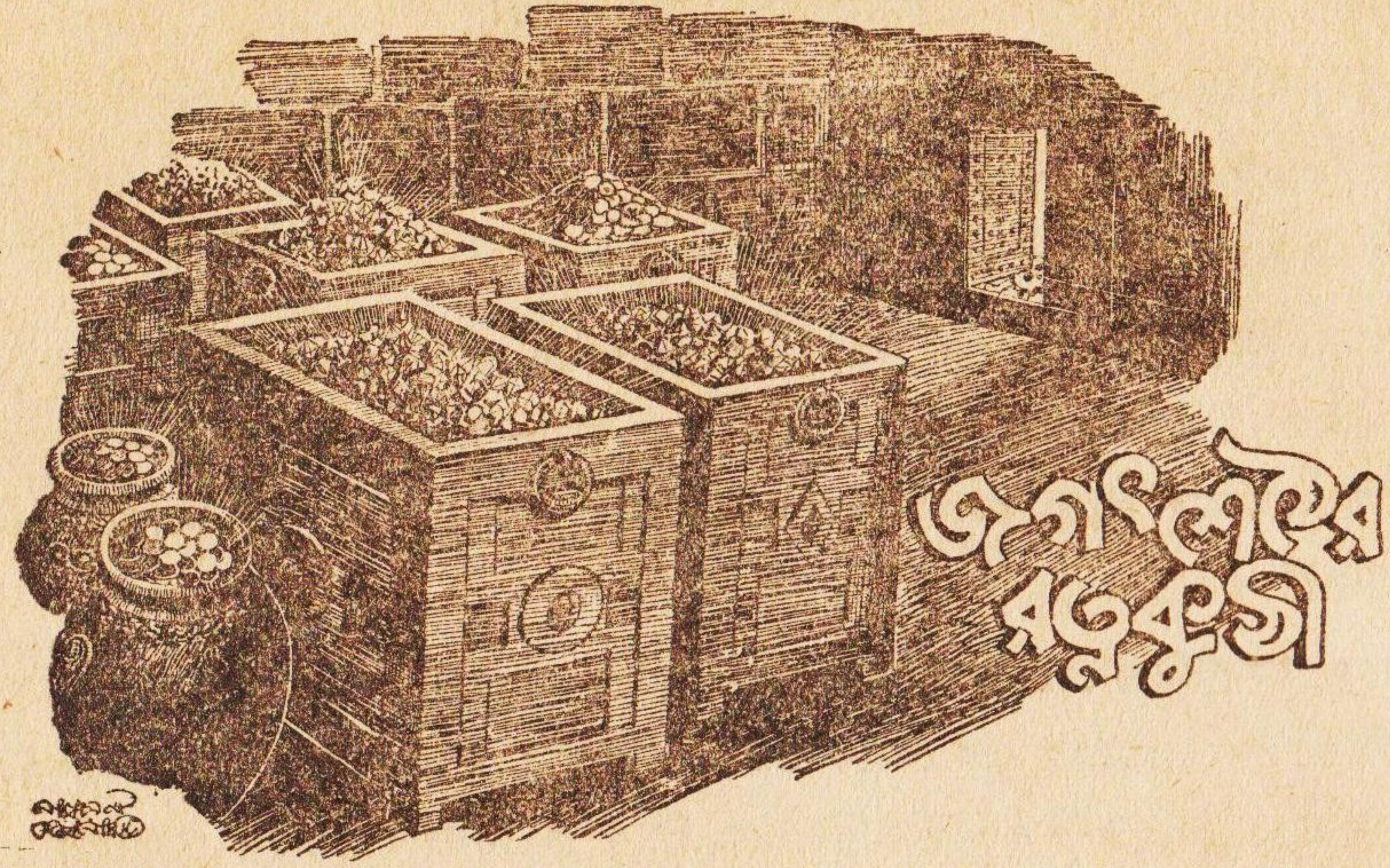
৺হেমেন্দ্রকুমার রায়

দ্বাদশ অধ্যায়

[অপ্রকাশিত উপন্যাস]

গুপ্ত নয়, ব্যক্ত ধন

(পূর্বানুবৃত্তি)

বাঁশঝাড় আর কলাবাগানের মাঝখানে, পায়ে-চলা পথের পাশে খানিকটা জঙ্গুলে জমি। সেইখানে ভয়াবহ বীভৎসতায় সোনালী সকালের আনন্দকে বিষাক্ত ক'রে তুলে মাটির উপরে প'ড়ে আছে রক্তধারার মধ্যে দুটো রক্তাক্ত নরদেহ—একটা মৃত ও আড়ষ্ট এবং আর একটা মৃতবৎ হ'লেও তখনও জীবিত। সকলে দাঁড়িয়ে পড়ল বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিতের মত।

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য তাদের মুখের কথা কেড়ে নিলে কিছুক্ষণ পর্যন্ত। তারপর সর্বাগ্রে নিজেকে সামলে নিয়ে মৌন ভঙ্গ করলে জয়ন্ত। মৃতদেহটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ ক'রে সে বললে, "দেখ মানিক, পুরুষের দেহে নারীর শাড়ি! ওকে চিনতে পারছ?"

সুন্দরবাবু চমৎকৃত মুখে ব'লে উঠলেন, "আরে হুম্! ঐ তো ফেরারী প্রতাপ চৌধুরী! ওর বুকে বেঁধা একখানা ছোরা, ওকে মারলে কে?"

"আমি!"

যে বললে তার মাথায় জটা, মুখে দাড়ি-গোঁফ। অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র। চিত

হ'য়ে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, "প্রতাপ চৌধুরীকে আমিই বধ করেছি। আমাকে চিনতে পারেন জয়ন্তবাবু?"

—"না। কে আপনি?"

—"ছদ্মবেশ না থাকলে চিনতে পারতেন। আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না, তাই যাবার আগে পরিচয়টা দিয়ে যাই। আমার নাম মানিকচাঁদ।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কি আশ্চর্য! তুমি তো ছিলে প্রতাপ চৌধুরীর প্রধান শাগরেদ, তারই সঙ্গে জেল ভেঙে পালিয়েছিলে!"

শ্বাস টানতে টানতে কষ্টের সঙ্গে মানিকচাঁদ বললে, "হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। কিন্তু তার পরের কথা আপনারা জানেন না। তার সঙ্গে জেল থেকে বেরিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, অসৎ পথে আর থাকব না, সৎ হব। প্রতাপ চৌধুরীকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। সে হ'ল আমার উপরে খড়্গহস্ত। আমি তার সমস্ত গুপ্তকথা জানতুম, সে আমাকে পৃথিবী থেকে একেবারে সরিয়ে দেবার জন্যে বার বার চেষ্টা করে। আত্মরক্ষার জন্যে আমি পালালুম, ছদ্মবেশ ধারণ করলুম। এমন হাঘরে যাযাবর-জীবন প্রাণ আমায় অতিষ্ঠ ক'রে তুললে। শেষটা তাকে পুলিসের হাতে আবার ধরিয়ে দিয়ে নিজে নিরাপদ হতে চাইলুম। তার অন্ধিসন্ধি আমি জানতুম, নিজে আড়ালে থেকে তাকে চোখে চোখে রাখতে লাগলুম। আপনাদের কাছে তার খবর সরবরাহ করতুম। নিজের পরিচয় দিতে পারতুম না, কারণ আমিও ফেরারী আসামী।"

তার কথা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হ'য়ে এসে একেবারে বন্ধ হবার মত হ'ল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে আর একবার সামলে নিয়ে মানিকচাঁদ কোনরকমে আবার বললে, "আজ সে পালাচ্ছিল, আমি তাকে বাধা দি। সে রিভলভার ছোঁড়ে, তখন নিজে চরম আঘাত পেয়েও তার বুকে ছোরা বসিয়ে আমি প্রতিশোধ নি।"

তার অন্তিমকাল উপস্থিত বুঝে বীরেন তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, "জগৎশেঠের রত্নকুঠীর কথা আপনি কিছু জানেন?"

কিন্তু মানিকচাঁদ নির্বাক। তার দুই চক্ষু মুদে এল।

জয়ন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "ভগবান মানিকচাঁদকে সৎপথের পথিক হবার সুযোগ দিলেন না ব'লে আমি দুঃখিত। আর বীরেনবাবু, আপনি ভাববেন না।

এইবারে জগৎশেঠের রত্নকুঠী নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করব। চলুন।"

বাড়িতে আবার ফিরে এসে জয়ন্ত বললে, "বীরেনবাবু, যে ঘর থেকে প্রতাপ চৌধুরী আপনার ঠাকুরদার গল্পের খাতার খানিকটা চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, আমরা এখন সেই ঘরে গিয়েই বসতে চাই।"

বীরেন শ্রান্ত স্বরে বললে, "কি হবে আর সেই গুদামঘরে গিয়ে? আমার মন ভেঙে পড়েছে, আর পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে ভালো লাগছে না।"

সুন্দরবাবু সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ বীরেনবাবু, আমারও ঐ মত। গুপ্তধন তো হ'য়ে দাঁড়াল অলীক দিল্লী কা লাড্ডু, আর মুখের কথায় হিল্লী-দিল্লী ক'রে বেড়িয়ে লাভ কি? প্রচুর কাদা ঘাঁটা হয়েছে, আমি এখন হস্ত-পদ বিস্তৃত ক'রে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে চাই। হুম্, চাই ঘুম!"

মানিক বললে, "আহা, যা বলেছেন! আমি এখনি একদৌড়ে বাজারে গিয়ে আপনার নাসিকার জন্যে এক শিশি সর্ষপ তৈল কিনে আনব কি?"

সুন্দরবাবু খাপ্পা হ'য়ে মানিকের পৃষ্ঠদেশে মুষ্টিপ্রহার করতে উদ্যত হলেন, সতর্ক মানিক একলাফে গিয়ে পড়ল হাত কয়েক তফাতে!

কিন্তু জয়ন্ত গোঁ ছাড়লে না, শেষ পর্যন্ত তাকে নিয়ে বীরেনকে উদ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে হাজির হ'তে হ'ল। তারপর অবহেলাভরে বললে, "এখন বলুন জয়ন্তবাবু, আপনার বক্তব্য কি?"

জয়ন্ত প্রথমে মুখে কিছু বললে না, স্তব্ধভাবে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল।

এটা গুদামঘরই বটে, নানান রকম একালে অব্যবহার্য জিনিস বাড়ির এই ঘরখানায় কোণঠাসা ক'রে রাখা হয়েছে—গুরুভার ও মস্তবড় লোহার সিন্দুক, আগাগোড়া কাঠের আলমারি, ডেস্ক, ভারী ভারী বাসনকোসন এবং গৃহস্থালীর ও গৃহসজ্জার কড়িখচিত দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি। শেষোক্ত জিনিসপত্রগুলিতে প্রাচীন বাংলাদেশের একটি নিজস্ব বিশেষত্ব ছিল। রকমারি কড়ির নামও ছিল ভিন্ন ভিন্ন—যেমন বিদন্তা, সিংহী, মৃগী ও হংসী প্রভৃতি। ঘরের কড়িকাঠ থেকে দোলনার মত ঝুলছে একটি কড়ির আলনা এশ্রেণীর জিনিস অধিকাংশ একেলে বাঙালী চোখেও দেখেনি।

একদিকে স্তূপীকৃত বা বিকীর্ণ হ'য়ে রয়েছে অনেক প্রাচীন পুস্তক।

জয়ন্ত শুধোলে, "ঐ বই-গুলোই বুঝি প্রতাপ চৌধুরীরা আলমারির ভেতর থেকে টেনে বার করেছিল?"

বীরেন বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বইগুলো যেভাবে ফেলে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই প'ড়ে আছে।"

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মত দুই-তিনখানা বই তুলে নিয়ে পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগল—মুখে তার চিন্তার লক্ষণ।

বীরেন অধীর স্বরে বললে, "জয়ন্তবাবু, আপনি কি আলোচনা করবেন বলছিলেন না?"

পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগল—

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ। বীরেন-বাবু, আপনি বোধহয় মনে করেন যে, জগৎশেঠের গুপ্তধন হস্তগত ক'রে প্রতাপ চৌধুরী শূন্যহস্তেই সদ্য সদ্য স্বর্গে বা নরকে যাত্রা করেছে?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে করি।"

—"উঁহুঁ, আমি তা মনে করি না।"

—"কেন করেন না?"

—"প্রমাণ দেখে।"

—"কি প্রমাণ?"

—"প্রথমত, গুপ্তধনের সন্ধানেই প্রথমে সে এই বাড়িতে এসেছিল। এখান থেকে সে চন্দ্রনাথবাবুর লেখা কাহিনী সংগ্রহ করে। সেই পাঁচ অংশে বিভক্ত

লেখা কাহিনীর তৃতীয় অংশ সে খাতা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে যায়, আমরা তা দেখতে পাইনি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সেই তৃতীয় অংশেই চন্দ্রনাথবাবু বর্ণনা করেছিলেন, শেঠেদের বাগানবাড়িতে গিয়ে দ্বিতীয়বার ইঁদারায় নেমে কেমন ক'রে তিনি গুপ্তধন দর্শন করেছিলেন। প্রতাপ চৌধুরীও তা পাঠ ক'রে সেখানে গিয়ে হাজির হ'য়ে দেখে যে, ইঁদারার মধ্যে গর্ভগৃহ আছে বটে, কিন্তু গুপ্তধন নেই।"

—"এটা আপনার যুক্তিহীন ধারণা।"

—"না, যুক্তিহীন নয়। প্রতাপ সেখানে গিয়ে গুপ্তধন পেলে পর আর আপনাকে আর আমাদের নিয়ে এত বেশী মাথা ঘামাতে আসত না, সানন্দে যাত্রা করত অজ্ঞাতবাসে।"

সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, "ঠিক, ঠিক! জয়ন্তের এ কথা জজে মানে!"

জয়ন্ত বললে, "তারপর দেখুন, সে কাল রাত্রে আবার এখানে এসেছিল। আজ যখন আমি প্রতাপের খোঁজে এই বাড়ির ঘরে ঘরে ঘুরছিলুম তখন দেখলুম যে, সে আর তার দলের লোকেরা বাড়ির নানা ঘরে ঢুকে দেয়াল আর মেঝে খুঁড়েছে, লোহার সিন্দুক আর আলমারি প্রভৃতি ভেঙে তচনচ ক'রে ফেলেছে। কেন তারা আবার এসেছিল? নিশ্চয়ই হাওয়া খেতে নয়! কি তারা খুঁজছিল? নিশ্চয়ই গুপ্তধন!"

বীরেন বললে, "আপনার মতকে আর অযৌক্তিক বলতে পারি না বটে, কিন্তু কোথায় সেই গুপ্তধন?"

—"গুপ্তধন হস্তগত করেছিলেন চন্দ্রনাথবাবু। কারবার পত্তন করবার সময়ে তার বেশ একটা মোটা অংশ খাটিয়ে বাকি অংশ তিনি লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।"

—"কোথায়?"

—"বীরেনবাবু, আপনাদের কলকাতার বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন কে?"

—"আমার বাবা।"

—"আপনার ঠাকুরদাও কি সেখানে বাস করতেন?"

—"না।"

—"তিনি থাকতেন কোথায়?"

—"ব্যবসা-সূত্রে তাঁর কলকাতায় আসা-যাওয়া ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্থায়ী ভাবে বাস করতেন এই বাড়িতেই।"

—"তাহ'লে গুপ্তধনের বাকি অংশও আছে এই বাড়িতেই।"

—"আবার জিজ্ঞাসা করি, কোথায়? প্রতাপ খুঁজতে কোথাও বাকি রেখেছে কি?"

—"অন্ধের মত খুঁজলে কিছুই পাওয়া যায় না।"

বীরেন এইবারে কিঞ্চিৎ শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বললে, "তাহ'লে চক্ষুষ্মানের মত খোঁজবার পদ্ধতি আপনিই দেখিয়ে দিন।"

জয়ন্ত অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "তাই দেখাব ব'লেই তো আমার এখানে আগমন।"

—"উত্তম। আমরা অপেক্ষা করছি।"

পকেট থেকে চন্দ্রনাথ লিখিত অসম্পূর্ণ কাহিনী সংবলিত খাতাখানা বার ক'রে জয়ন্ত বললে, "বীরেনবাবু, আপনার ঠাকুরদার রচনার পঞ্চমাংশে অর্থাৎ উপসংহারে কি আছে, ভোলেন নি তো?"

—"আছে একটা অর্থহীন পদ্য বা ছড়া। কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই।"

—"কে বললে সম্পর্ক নেই? কে বলে তা অর্থহীন? আপনি যা ভেবেছেন, প্রতাপ চৌধুরীও তাই ভেবেছিল, সেইজন্যেই আঁধার ভেদ ক'রে ফুটে ওঠে নি আলোর রেখা। আমিও প্রথমে সেই পদ্যটিকে অগ্রাহ্য করেছিলুম, কিন্তু তার পরে মনে মনে তাকে নিয়ে যথেষ্ট ভেবেচিন্তে রীতিমত অর্থের সন্ধান পেয়েছি!"

—"অর্থ না অনর্থ?"

—"না, অনর্থের মধ্যেই সত্য অর্থ। অর্থাৎ সেই পদ্যটিই ব্যক্ত ক'রে দিয়েছে গুপ্তকে। অতঃপর আমি সেই পদ্যের নির্দেশ মেনেই গুপ্তধন অন্বেষণ করব।"

সকলে অবাক হ'য়ে জয়ন্তের কাণ্ডকারখানা নিরীক্ষণ করতে লাগল বিস্মিত-নেত্রে। অনুরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য অন্বেষকরা যা করে জয়ন্ত সে সব কিছুই করলে না—অর্থাৎ সিন্দুক, আলমারি, দেরাজ, ডেস্ক বা বাক্স প্রভৃতি হাঁটকেও দেখলে না কিংবা ঘরের ছাদ, দেওয়াল কি মেঝে ঠুকেও দেখলে না কোন জায়গা ফাঁপা বা নিরেট।

সে প্রথমে বিকীর্ণ ও স্তূপীকৃত পুস্তকগুলোর প্রত্যেকখানা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি

হস্তচালনা ক'রে গেল। তারপর বাসনকোসনগুলোও নেড়েচেড়ে দেখলে। তারপর কড়িকাঠ থেকে ঝুলন্ত কড়ির আলনার দিকে উচ্চমুখে, স্থিরনেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

সুন্দরবাবু বললেন, "কি হে, আলনা দেখে একেবারে থ হ'য়ে গেলে যে!"

—"হ্যাঁ, কড়ির কারুকার্য-করা সুন্দর আলনা, একালে আর দেখা যায় না। দণ্ডটা অন্তত চার হাত লম্বা আর এক বিঘত মোটা। দণ্ডের সমস্তটা পুরু লাল কাপড়ের আবরণ দিয়ে মোড়া আর উপরে বসানো অজস্র কড়ি। হংসী কড়ি, কারণ রং সাদা। সুন্দরবাবু, সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর আগেও কলকাতায় আর মফস্বলে বাজারে কড়ি ফেলে জিনিস কেনা যেত, জানেন কি?"

—"না। ঐ কি তোমার গুপ্তধন?"

—"উঁহুঁ, ও হ'চ্ছে এখন বাজারে অচল ব্যক্ত ধন, সবাই দেখেও দেখতে চায় না। কিন্তু আলনাটা একবার নীচে নামালে হয় না?"

—"ধেৎ, কেন?"

—"আরো ভালো ক'রে সেকেলে কারিগরের কারিগুরি দেখব।"

—"তোমার যত সব ছেলেমানুষী বায়না!"

কিন্তু জয়ন্ত যা ধরে, আর ছাড়ে না। কাজেই দড়ি ছিঁড়ে আলনাটাকে নীচে নামিয়ে আনতে হ'ল।

জয়ন্ত মাটির উপরে ব'সে প'ড়ে দুই হাতে দণ্ডটাকে নাড়াচাড়া ক'রে বললে, "এটা খুব ভারী, নিরেট ব'লে মনে হয়। সেকালের লোকরা ভারী ভারী আসবাব বানিয়ে ধনগর্ব প্রকাশ করত আর একালের আমরা হ'চ্ছি সূক্ষ্মতার ভক্ত। কড়িখচিত লাল আবরণীর তলায় কাঠ আছে ব'লেই মনে হয়। বীরেনবাবু, একখানা করাত বা ধারালো কাটারি এনে দিতে পারেন?"

—"কি আশ্চর্য, কি করবেন?"

—"আনলেই দেখতে পাবেন।"

করাত ও কাটারি দুইই পাওয়া গেল। জয়ন্ত বিনাবাক্যব্যয়ে কড়ির আলনার একটা প্রান্ত কেটে ফেলে বললে, "এটা দেখছি বিশেষভাবে তৈরী ফাঁপা জিনিস। তবু এত ভারী কেন?"

সে ভিতরে হাত চালিয়ে দিয়ে যা বাইরে টেনে আনলে তা হ'চ্ছে এমন চমকপ্রদ, অভাবিত জিনিস যে, সুন্দরবাবু, মানিক ও বীরেন বিস্ময়ে, আনন্দে ও উত্তেজনায় মুহ্যমান হ'য়ে স্তম্ভিতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল মৌন শিলামূর্তির মত! তার মধ্যে ছিল হীরক, নীলকান্তমণি, মরকত, পদ্মরাগ ও মুক্তা প্রভৃতি মহামূল্য রত্নরাজি! আরো কয়েকবার হস্তচালনার ফলে কক্ষতলে ছড়িয়ে পড়ল আরো কয়েক মুঠো মণিমুক্তা! যেন দীপ্যমান ইন্দ্রধনুর খানিকটা খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ছড়িয়ে প'ড়ে সৌন্দর্যস্নান করছে প্রভাতী সূর্যকিরণে! শুভ্র, হরিৎ, নীল, পীত ও রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের সে কি অপরূপ সমুজ্জ্বল পুলকোচ্ছ্বাস!

ভিতরে হাত চালিয়ে যা বাইরে টেনে আনলে···

জয়ন্ত পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বললে, "বাইরে যা এনেছি তাইই যথেষ্টরও বেশী! ভিতরে রইল আরো কত লক্ষ টাকার ঐশ্বর্য, আমার কল্পনায় তা আসে না! এখন আপনাদের কিছু বলবার আছে?"

সুন্দরবাবু কেবল বললেন, "হুম্!"

মানিক বললে, "জয়ন্তের কথা শুনে আর ভাবভঙ্গি দেখে আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলুম, আজ এখানে এমনি কোন অপূর্ব আর আশ্চর্য ব্যাপারই দেখতে পাব!"

বীরেন অভিভূত ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "জয়ন্তবাবু জয়ন্তবাবু আপনি ঐন্দ্রজালিক ! না না, আপনি তারও চেয়ে বিস্ময়কর !"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, "অত্যুক্তি করবেন না বীরেনবাবু ! আমি কেবল সহজ বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারি, আপনি যা পারেন না।"

বীরেন বললে, "এখনো বুঝতে পারছি না, আমার গলদ হয়েছে কোন্‌খানে ?"

—"কেন আপনি খাতার পদ্যটিকে অর্থহীন শব্দসমষ্টি ব'লে মনে করেছিলেন ?"

বীরেন বললে, "তার অর্থ আপনিই আমাকে বুঝিয়ে দিন।"

জয়ন্ত হাস্যমুখে বললে, "অর্থ তো স্বতঃস্ফূর্ত ! তার কতক অংশ আবার শুনুন ঃ

'কিন্তু আমি ঠিক জানি ভাই !
গুপ্ত পথে রপ্ত সবাই,
সর্বজনের সামনে লুকোয় সহজ পথের পন্থী !'

তারপর স্পষ্ট কথা ঃ

'মানসনয়ন যে খুলে চায়
সত্য মানিক সে-ই খুঁজে পায়,
মূর্খ শুধু রত্ন খোঁজে মস্ত লোহার সিন্দুকে !'

টীকা করব ? চন্দ্রনাথবাবু বলছেন, 'গুপ্ত পথে চলতে সবাই অভ্যস্ত। যা গুপ্ত, তাকে আবিষ্কার করতে গেলে সকলেই আগে গোপনীয় স্থানই অন্বেষণ করে। যা চোখের সামনাসামনি থাকে, তাকে অবহেলা করা হয়। এইজন্যে যার সহজ বুদ্ধি আছে, সে সকলেরই চোখের সামনে অনায়াসে অবস্থান ক'রেও কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তারই অন্বেষণা সফল ও তারই ভাগ্যে মণিমাণিক্য লাভ হয়, যার মানসনেত্র উন্মুক্ত। কিন্তু মূর্খেরা ভাবে, রত্নের সন্ধান পাওয়া যায় কেবল প্রকাণ্ড লৌহসিন্দুকেই !' বীরেনবাবু, এই পদ্যই হয়েছে আমার চাবিকাঠি, আর তারই সাহায্যে খুলেছি আমি রহস্য-সিন্দুক ! সুতরাং—"

সুন্দরবাবু বললেন, "সুতরাং—
জয়ন্তের কথা ফুরালো,
বীরেনের ব্যথা জুড়ালো !
হুম্, আমিও বাবা পদ্য-টদ্য রচনা করতে পারি,—দেখছ তো !"

—শেষ—

[আগামী সংখ্যা থেকে রাজকুমার মৈত্রের রোমাঞ্চকর ছোটদের উপন্যাস ধারাবাহিক রূপে বেরোবে।]